দশদিন

শ্রীজলধর সেন

দশ দুয়ানি

দশজনকে

উৎসর্গ করিলাম।

দশ কথা।

'দশে'র অনুপ্রাসের খাতিরে 'দশ কথা' নাম দিলাম,—এতটুকু বইয়ের ভূমিকা লিখিতে দশ কথা কোথায় পাইব!

বইখানির নাম **'দশ দিন'**; আয়তন **দশ** ফর্ম্মা; ছবি আছে **দশ** খানি; উৎসর্গ করিয়াছি **দশ** জনকে; মূল্য স্থির করিয়াছি **দশ** দুয়ানি;—তাই ভূমিকার নাম **দশ** কথা;—কথা কিন্তু অতি কম—বইখানিতেও কম, ভূমিকাতেও কম।

বইখানির জন্য আমি যাঁহাদের নিকট সহায়তা লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই নামোল্লেখ যথাস্থানে করিয়াছি। কিন্তু একজনের নাম উল্লেখ করিবার অবসর পাই নাই, তিনি শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই বইখানির আগাগোড়া ঠিক করিয়াছেন, ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, প্রুফ দেখিয়াছেন,—এবং এই নাবালক ঐতিহাসিক আমার পুস্তকের একজন প্রকৃত সমালোচক। শ্রীমান্ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয় বিনামূল্যে দশখানির মধ্যে আটখানি ব্লক প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন; অবশিষ্ট দুইখানি ব্লক বর্দ্ধমানের মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর দান করিয়াছেন। এখন, এই সকল মহোদয়ের নিকট যদি বর্ত্তমান ভদ্রতার হিসাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাই, তাহা হইলে তাঁহারা যষ্ঠি-হস্তে আমাকে তাড়া করিবেন; কারণ যাঁহাদের

নাম করিয়াছি, তাঁহাদের কাহারও সহিত আমার কৃতজ্ঞতার সম্বন্ধ নাই ;—বর্দ্ধমানের মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমান হরিদাস সুধাংশু পর্য্যন্ত সকলেই আমাকে সাহায্য করিতে বাধ্য—আমি যে তাঁহাদেরই। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি না—আমি নামোল্লেখ করিলাম মাত্র।

পরিশেষে পাঠকপাঠিকাগণের নিকট একটী প্রার্থনা। অনেকেই ভূমিকায় বলেন 'পাঠকপাঠিকাগণ যদি পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলেই আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সফল হইবে।' আমি এমন কথা বলিতে পারিতেছি না ; আমি বলিব "এই কাগজের দুভিক্ষ এবং ছাপাখানা ও দপ্তরীর অত্যধিক দাবীর দিনে আমার এই পুস্তক-প্রকাশের খরচ উঠিয়া গেলে (লাভ পরের কথা) আমার এই দশ কথা বলা সফল হইবে।" এখন এই পূজার বাজারে দশজনে যদি দশ-দশে এক-শখানি করিয়া কেনেন, তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩২৩

শ্রীজলধর সেন।

"কোথায় কৈলাসভূমি, কোথায় আমি বা আজি।
কোথায় বালুকাস্তূপ, বন বৃক্ষ লতারাজি ॥
কোথায় যমুনারাণী, কোথা 'জয় শিব' ধ্বনি,
উঠে যে মধুর বাণী শত-নর-কণ্ঠে সাজি।
কোথায় আমার গুহা, যথা নাহি দ্বেষ স্পৃহা,
যথা উঠে ঊর্দ্ধে সদা প্রণবের ভেরী বাজি ॥"

—বিজয়ানন্দ।

বিজয়ানন্দ বিহার
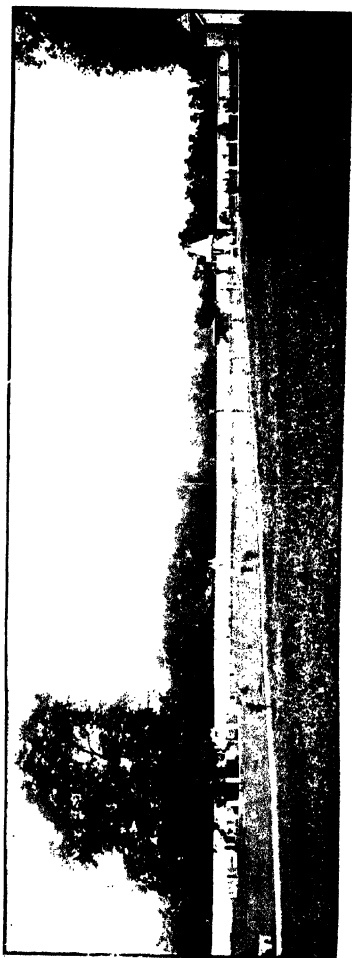
দশদিন

ছুটী

অমর কবি মধুসূদন লিখিয়াছেন—

——“রাজেন্দ্র-সঙ্গমে

দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।”

কথাটা আমি বিগত পূজার পর সার্থক করিয়াছি,—দীন আমি “রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দূর তীর্থ দরশনে” গিয়াছিলাম। নানা তীর্থে যাই নাই; দুইটি তীর্থে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দুইটিই ভারতের সর্ব্ব-প্রধান তীর্থস্থান;—এক শ্রীশ্রীকাশীধাম—হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান তীর্থ; আর এক আগরা—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান তীর্থস্থান। একটি ভক্তির তীর্থ, আর একটি প্রেমের তীর্থ; এক তীর্থে ত্রিলোকপাবন, বিঘ্নবিনাশন, ভোলানাথ, বিশ্বনাথ;—আর এক তীর্থে প্রেমের বিজয়-বৈজয়ন্তী তাজমহল! দুই-ই সমান,—দুই-ই অনন্তের পথ দেখাইয়া দেয়;—দুই-ই পাপতাপক্লিষ্ট, ব্যথিত, অভিশপ্ত হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করে। বারাণসীতে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে দাঁড়াইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া ‘বাবা বিশ্বনাথ’ বলিয়া ডাকিলে যেমন হৃদয় শীতল হয়,—সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণা

মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর হইয়া যায়,—সব যেন ধুইয়া মুছিয়া যায়; তেমনই আগরা-তলবাহিনী যমুনার তীরে চন্দ্রমাশালিনী যামিনীতে জ্যোৎস্না-স্নাত তাজের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া একবার একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে—একবার সেই প্রেমে গঠিত সৌধের দিকে চাহিলে হৃদয়ের সব মলিনতা কোথায় চলিয়া যায়;—প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়; প্রেমের সেই লোক-মনোহর পার্থিব দেবমূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত হয়;—আর তখন অতি দীন, অতি হীনের অবনত-মস্তকে সেই পরম প্রেমময় দেবতার চরণ-স্পর্শ অনুভূত হয়! ক্ষণেকের জন্য জীবন ধন্য হইয়া যায়;—মনে হয়, কতযুগের কত পুণ্যফলে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি,—কত সুকৃতির ফলে ভারতবর্ষে জন্মিয়াছি,—কত সাধনার বলে 'আমার বারাণসী' 'আমার বাবা বিশ্বনাথ' 'আমার তাজমহল' বলিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। বল—"আনন্দ হয়!"

আমি দশদিনের জন্য এই দুই আনন্দ-নিকেতন দর্শনের ছুটী পাইয়াছিলাম। এখন আর ছুটী মিলে না—মিলিবার যো নাই। যখন-তখনই ত ছুটী পাইয়া ছুটিতে ইচ্ছা করে—উধাও হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে; ইচ্ছা করে—

"উড়ে যাই বিমানের পথে—
শীতল বাতাস লাগুক গায়।"

কিন্তু তা হয় কৈ! পদদ্বয় লৌহ—কেহ বলিবেন—স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। লৌহ-নির্ম্মিতই হউক, আর স্বর্ণ-নির্ম্মিত, মরকত-

খচিতই হউক—শৃঙ্খল ত!—গতিশক্তি রোধ করে ত! দুই দিনের ছুটী করিতে গেলে চারিদিক হইতে দশ-পনরখানি ব্যগ্রহস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া কতকগুলি কণ্ঠ একস্বরে চীৎকার করিয়া বলে—"ওগো, কর কি? কোথায় যাও?"

ছুটী পাওয়া বড়ই দুর্ঘট! কতবার ছুটিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে;—জীবনে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে—তবুও ছুটীর সময় হয় নাই;—কবিশ্রেষ্ঠ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের বেদনা-কাতর, অশ্রুপ্লাবিত ভাষায়, হৃদয়ের সকল তন্ত্রী ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, করুণকণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা হয়—

"এখনও যদি হয় নি সময়,
আর কি সময় হবে—
ঘনায়ে আসিল মৃত্যুলগন
মিলন-লগ্ন কবে?
এত দিবসের এত তপস্যা
ব্যর্থই যদি হয়,
জীবন-শেষের নিমেষেও যদি
নয়নে অশ্রু বয়;
চিরদিবসের দেবতা আমার,
জীবন-বন্ধু মোর—
এমন করিয়া জীবন ভরিয়া
কে চাবে করুণা তোর!"

দশদিন

কতবার চেষ্টা করিয়াও যে ছুটী মিলে নাই, বিগত পূজার পর (১৩২২, ৫ই কার্ত্তিক; ২২এ অক্টোবর ১৯১৫) পূর্ণিমা তিথিতে, কেমন করিয়া সে শুভ-সংযোগ হইল ঠিক বলিতে পারি না। সেই বহুদিনের ঈপ্সিত ছুটী মিলিল—একেবারে **দশ-দিনের** ছুটী। বল—'**আনন্দ হর!**'

সকলেই প্রতিবৎসর পূজার অবকাশে, আফিসের বন্ধে, নানা-স্থানে যায়। আমার ত পূজাও নাই, অবকাশও নাই, আফিসের বন্ধও নাই। আমার আফিস বার-মাস, তিনশত-পঁয়ষট্টি দিনই খোলা। এক আফিস যদি বা বন্ধ হয়, আর এক আফিসের দ্বার আর বন্ধ হইতে জানে না—বন্ধ হইতে চায় না। সকলে আফিস বন্ধ পাইয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে যায়,—'শীতল বাতাস' গায়ে লাগাইতে যায়;—আমি এক আফিসের দ্বার কয়েকদিনের জন্য বন্ধ করিয়া, আর এক চিরদিনের খোলা-আফিসের চির-মুলতবী কাজের দপ্তর মাথায় বহিয়া, প্রবাস-নগরী ত্যাগ করিয়া, আমার ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত, মৃত্যুকাতর, জনবিরল পল্লীভবনে যাই। এমনই করিয়া কত পূজা আসিল, কত পূজা গেল!

এবারও তাহাই স্থির করিয়াছিলাম। পূজার দুই তিন দিন পূর্ব্বে আলিপুরের 'বিজয়-মঞ্জিলে' বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহা-দুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। নানা কথার পর তিনি বলি-লেন, 'তা হ'লে বাড়ী যাওয়াই স্থির করলেন।' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞা হাঁ, আমার ত ছুটী নেই।' তিনি বলিলেন 'দশদিনের

ছুটীই হোক না। চলুন, পূর্ণিমার দিন দুইজনে কৈলাসে যাই।'

অন্য সময় হইলে ইতস্ততঃ করিতাম; তখন কি জানি কেন, আর ইতস্ততঃ করিলাম না; অমনি বলিয়া ফেলিলাম, 'বেশ, তাই হবে—আমার দশদিনের ছুটী।' বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আদেশ করিলেন, সুতরাং তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে—তাহা নহে; মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অনেক আদেশ প্রতিপালন না করিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছি। সে ভয় তাঁহার নিকট আমার ছিল না—এখনও নাই। মহারাজের আদেশ নহে—বন্ধুর অনুরোধও নহে—আত্মীয়ের আগ্রহও নহে,—অথচ এই সবই; এবং আরও কিছু। এক-পথের যাত্রীর নিমন্ত্রণ—আহ্বান! ইহারই জন্য দশদিনের ছুটী মিলিল। কে মিলাইল জানি না, কিন্তু মিলিল। 'ভারতবর্ষের' স্বত্বাধিকারী শ্রীমান হরিদাস ও শ্রীমান সুধা ভায়াদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর গ্রহণ করিলাম না;—কাজকর্ম্মের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করিবারও প্রয়োজন মনে করিলাম না;—কোন দ্বিধাই করিলাম না। শ্রীমান হরিদাস ও সুধা ভায়াদ্বয় নিশ্চয়ই অমত করিবেন না; স্নেহের জোরেই ছুটী মিলিবে। তাহাই হইল; শ্রীমানদ্বয় সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন; 'ভারতবর্ষের' গুরুভার **দশদিনের** জন্য আমার স্কন্ধ হইতে নামিয়া আমার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইবার ব্যবস্থা হইল। উপেন্দ্র দাদাও সানন্দে স্বীকৃত হইলেন।

বৰ্দ্ধমানে

ছুটী যখন স্থির হইয়া গেল, তখন স্ত্রীপুত্রকন্যাগণকে দেশে পাঠাইয়া আমি একাকী পূজার কয়দিন কলিকাতায় কাটাইলাম; কাজকর্ম্মের একটা ব্যবস্থা ত করিয়া যাইতে হইবে—**দশ দিনের** জন্য ত নিশ্চিন্ত হইতে হইবে।

দেখিতে দেখিতে যাত্রার পূর্ব্বদিন আসিয়া পড়িল। আমি আলিপুরে যাইয়া শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটু নূতন রকম ব্যবস্থা করিলাম। স্থির হইল যে, আমি পরদিন অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকালের গাড়ীতে বর্দ্ধমানে যাইব। সেখানে সমস্ত দিন থাকিয়া রাত্রি এগারটার সময় ষ্টেশনে মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সহিত মিলিত হইব। আমার এ ব্যবস্থা করিবার একটি বিশেষ কারণ ছিল; তাহা এইস্থানে বলিতেছি।

বর্দ্ধমান-গমনের আমার প্রধান আকর্ষণ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর; কিন্তু তিনি যখন বর্দ্ধমানে অনুপস্থিত,তখন আমি সেখানে যাই কেন? বর্দ্ধমানে আমার আরও একটি আকর্ষণ আছে; তাহা মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের নবপ্রতিষ্ঠিত দেবস্থান—**'বিজয়ানন্দ-বিহার।'**

দশদিন

এই বিহার যে কি সুন্দর, কি পবিত্র স্থান, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। সে দেবস্থানের, সে 'বিজয়ানন্দ-বিহারের' বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত ; আর সাধ্যায়ত্ত হইলেও আমি সে কার্য্যে অগ্রসর হইতাম না। যাহা কেবল হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হয় ; যাহার প্রত্যেক মন্দির, প্রত্যেক স্থান নির্ম্মাতার ধ্যানলব্ধ, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে তেমনই ধ্যান-পরায়ণ হইতে হয়, তদ্‌ভাবের ভাবুক হইতে হয়। আমাতে সে ভাবের কণামাত্রও নাই। আমি কেন বৃথা শব্দাড়ম্বর করিয়া সে স্থানের, সেই অতুলনীয় দেবভবনের অবমাননা করিব ? বিশেষতঃ, আমি 'বিজয়ানন্দ-বিহারের' সবটা একসঙ্গে দেখিয়া উঠিতে পারি নাই। যখনই বৰ্দ্ধমানে গিয়াছি, তখনই প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, সহস্রকার্য্য ত্যাগ করিয়া, ঝড়বৃষ্টি মেঘগর্জ্জন উপেক্ষা করিয়া, 'রমণার' শালবন অতিক্রম করিয়া 'বিজয়ানন্দ-বিহারে' উপস্থিত হইয়াছি ; এবং যেখানে হয় একস্থানে বসিয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সে চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া মন্দিরাধিষ্ঠিত দেবাদিদেবের আরতি দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। সুতরাং 'বিজয়ানন্দ-বিহার' তেমন করিয়া দর্শন কোন দিন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই,—এ জীবনে ঘটিবে কি না, তাহাও বলিতে পারি না। এ অবস্থায় আমি সে দেব-নিকেতনের বর্ণনা কেমন করিয়া করিব ?

এই 'বিজয়ানন্দ-বিহারে' লক্ষ্মী-পূর্ণিমার সন্ধ্যা অতিবাহিত

করিবার জন্যই আমি বর্দ্ধমানে যাওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলাম ; মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ইহাতে আপত্তি করিলেন না।

শুক্রবার দশটার গাড়ীতে আমি বর্দ্ধমানে গমন করিয়া পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম ; রাজা অনুপস্থিত, তাই রাজভবনে গেলাম না। তাহার পর অপরাহ্নকালে 'বিজয়ানন্দ-বিহারে' গমন করিলাম। সেখানে সন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়া, দেবাদিদেবের আরতি অনেকদিন পরে দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং রাত্রি দশটার সময় প্রস্তুত হইয়া বর্দ্ধমান ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

যথাসময়ে পঞ্জাব মেল-গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের 'সেলুন' গাড়ী ট্রেণের পশ্চাদ্‌ভাগে সংলগ্ন ছিল। গাড়ী ষ্টেশনে আসিবামাত্র তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ষ্টেশনে উপস্থিত কর্ম্মচারীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ীর দিকে গমন করিলাম। আমাদের জন্য একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী রিজার্ভ করা ছিল। আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলাম। মহারাজের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমান ললিতমোহন দাস, প্রধান চিকিৎসক শ্রীমান নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এবং চিত্রকর শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ সেই কক্ষে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা আনন্দভরে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পরই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

তীর্থপথে

কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, আমি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইবে। সে অপকর্ম্ম আমি আর করিতে সম্মত নহি; এবং তাহার জন্য নিজের অক্ষমতার কথা যথাযোগ্য বিনয়সহকারে নিবেদন করিবারও কোন প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। এই মাত্র বলিয়া রাখিতেছি, আমার এ 'দশদিন' ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নহে। তবে ইহা কি? তাহাও আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। লেখনী-কণ্ডুতি? হয় ত বা তাহাই! অথবা বৃদ্ধের প্রলাপ? হইতে পারে। যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, আমি কিছুই বলিতে পারিব না।

একে মেল ট্রেণ—এক এক রাজ্য অতিক্রম করিয়া তবে দম ফিরায়; তাহার পর রিজার্ভ-টিকিটমারা ইলেকট্রিক-আলোকিত, ইলেকট্রিক-পাখাসংযুক্ত দ্বিতীয়শ্রেণীর গাড়ী; তাহার পর বেঞ্চজোড়া সুবিস্তৃত সুকোমল শয্যা; তাহার পর শ্রীমান নন্দলাল-ললিতের আনন্দোচ্ছ্বাস। আরে রাম! ইহার নাম কি ভ্রমণ বলে? ভ্রমণ করিব—তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে;—বসিব এক বেঞ্চে পাঁচ জনের স্থানে এগারজন;—প্রত্যেক ষ্টেশনে আরোহণেচ্ছু যাত্রীর সহিত রীতিমত বচসা করিব; গাড়ীর দ্বারের হাতল টানিয়া ধরিয়া যাত্রীর বল পরীক্ষা করিব; 'এ গাড়ীমে যায়গা নেহি, দুসরা গাড়ীমে যাও' বলিয়া-বলিয়া গলা শুকাইয়া ফেলিব; আরোহণে

অকৃতকার্য্য, প্ল্যাটফরমস্থিত যাত্রীর সুমধুর বাক্যবর্ষণে এবং নূতন-নূতন সম্বন্ধ স্থাপনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিব; পাটের কলে পিষ্ট পাটের বাণ্ডিলের মত চাপা পড়িয়া বসিব,—আর ও কত কি করিব। তাহারই নাম ভ্রমণ! আর এ কি না, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, ইলেক্‌ট্রিক পাথার হাওয়া খাইতে-খাইতে নিদ্রার কোলে নিশ্চিন্তভাবে আত্ম-সমর্পণ! আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, ইহার নাম ভ্রমণ বলে না;—ইহাকে গমন বল, অভিযান বল, আর যাহা খুসী তাহাই বল,—ভ্রমণ বলিও না। অতএব ইহা আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নহে—নহে—নহে। প্রমাণ—আমরা পরদিন সন্ধ্যার পর তণ্ডুলা ষ্টেশনে নামিয়া গাড়ী-বদল করিয়া আগরার গাড়ীতে উঠিলাম এবং রাত্রি নয়টার সময় আগরায় পৌঁছিয়া মহারাজার প্রাসাদে অর্দ্ধ-অতিথি হইলাম। 'অর্দ্ধ' কথাটার টীকা করিতে হইতেছে। আমি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের পূরা অতিথি; কিন্তু রাজ-প্রাসাদের অর্দ্ধ-অতিথি; কারণ আমার ভোজন রাজপ্রাসাদে হইত, কিন্তু আমার শয়নের জন্য রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে মহারাজা-ধিরাজ বাহাদুর একটি সাহেবের উদ্যানবাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন।

এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমার এ **দশদিন** ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নহে। আমার সোদরাধিক স্নেহভাজন, 'সাহিত্য'-সম্পাদক শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যখন-তখনই বলেন "দাদাকে একবার কোন্নগর ঘুরাইয়া আনিতে পারিলেই একখানি মাসিক-পত্রের ছয়মাসের খোরাক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।" সেই আমি

কোন্নগর নয়, বর্দ্ধমান নয়, দেওঘর-মধুপুর নয়,—একেবারে সেই অনেক দূর—সেই এক রাজার রাজ্য পার হইয়া, আর এক রাজার রাজ্য অতিক্রম করিয়া আগরায় গমন করিলাম; আর এই সুদীর্ঘ পথের কথা তিন চারি লাইনেই শেষ করিলাম। আমি যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতেছি না, তাহার প্রমাণ ইহার অপেক্ষা আর অধিক সন্তোষজনক কি হইতে পারে?

তবুও '**দশদিন**' লিখিব; দশ কথাতেই লিখি, আর দশ-দশে একশত পাতেই লিখি,—আমাকে লিখিতেই হইতেছে। কেন? কৈফিয়ৎ আপাততঃ মুলতবী থাকুক।

এখন কি লিখি? ভাবিয়া দেখিলাম, আগরা এবং কাশীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় সে সম্বন্ধে আরও-না-হয়-ত শতাধিক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার যে কোন একখানি পড়িলেই সমস্ত বিবরণ অবগত হইতে পারা যায়। তাহার জন্য আর আয়াস-স্বীকারের কোন প্রয়োজনই নাই। আমিও আগরা বা কাশীধামে তেমন করিয়া বেড়াই নাই, ঘুরিয়া বেড়াইবার ইচ্ছাও হয় নাই।

এখন হয় ত কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন—'তবে এতদূর গিয়াছিলে কেন?' আমি আগরায় গিয়াছিলাম তিনটি দৃশ্যের আকর্ষণে। তাহার মধ্যে প্রথম কৈলাস, দ্বিতীয় ফতেপুর সিকৃরি এবং তৃতীয় তাজমহল। আমার এই পর্য্যায় দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি

তাজমহলকে সর্ব্বনিম্ন আসন প্রদান করিতেছি। আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি যে, এই তিনটির কেহই কাহারও অপেক্ষা কম নহে—সকলেই প্রথম—সকলেই শ্রেষ্ঠ!

তাজমহল

আগরার কথা যিনিই বলিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বাগ্রে তাজমহলের কথাই বলিয়াছেন। মহাজনগণের প্রদর্শিত এ পন্থা আমিই বা অনুসরণ করিব না কেন? কিন্তু এই স্থানেই আমার বিপদ। তাজমহলের বর্ণনা—সে ত আমার মত গণ্ড-মানুষের কর্ম্ম নহে। আমি যাহাতে প্রতিদিন প্রতিরাত্রিতে তাজমহল দেখিতে পারি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি হয় ত মনে করিয়াছিলেন, আমি একেবারে তাজমহলের সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইব—আত্মহারা হইয়া যাইব; কিন্তু আমি যে সে উপাদানে নির্ম্মিত নহি। তাজমহল দেখিতে হইলে যে চক্ষু, যে হৃদয় লইয়া ঐ পবিত্র দেবমন্দিরের সম্মুখীন হইতে হয়, সে চক্ষু, সে হৃদয় আমার নাই। সুতরাং আমি সুধু দিবাভাগে হা করিয়া তাজের নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়াছি আর চন্দ্রমাশালিনী যামিনীতে সেই জ্যোৎস্নাস্নাত তাজমহলের পার্শ্বে বসিয়া ভাবিয়াছি,—এ কি একটা সৌধ, না আমার সম্মুখে একটা মহতী কল্পনার ছায়াবাজি। এ কি সত্যসত্যই একটা

জড় কিছু, না আমার দৃষ্টিবিভ্রম! আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। রবিবার রাত্রিতে শ্রীমান ললিতমোহন আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। আমরা দুইজনে অনেকক্ষণ তাজের পার্শ্বে শয়ন করিয়া ছিলাম। রাত্রি অধিক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া শ্রীমান আমাকে বলিলেন, "চলুন, যাওয়া যাক্।" আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "চল যাই।" তিনি বলিলেন, "এতক্ষণ কি দেখিলেন?" আমি বলিলাম "কিছুই না।" শ্রীমান ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি জেরা করিতে লাগিলেন। আমি অবশেষে হতাশ হইয়া বলিলাম "কি দেখিলাম, ঠিক বলিতে পারিতেছি না! আমার সুধু মনে হইতেছে, যাহা দেখিলাম তাহা—

"স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

শ্রীমান্ আর কোন কথা বলিলেন না। আমরা নীরবে তাজমহল ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

আমার মনে হয়, বাঁশীর স্বরলহরোত্থিত অমূর্ত্ত রাগিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া—মর্ম্মরের রূপ ধরিয়া এখানে মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছে। তন্দ্রালস রাগিণীর মূর্ত্ত চিত্র যদি দেখিতে চাও;—যদি দাম্পত্য-প্রেমের অবিনশ্বর কীর্ত্তি দেখিতে চাও—যদি দেখিতে চাও মোগলসম্রাট্ শাহ্‌জহানের জীবনের সুখ-স্মৃতি—যদি দেখিতে চাও প্রেমের কমনীয় মূর্ত্তি, তবে মোগলসম্রাট্‌দিগের লীলাস্থল আগরা নগরীর পাদদেশচুম্বী নীলসলিলা যমুনার তটে আসিয়া ভুবনবিশ্রুত সৌন্দর্য্যাধার এই তাজ একবার নয়ন ভরিয়া

চাহিয়া দেখ ;—চাহিয়া দেখ, সম্রাট্ শাহ্‌জহানের বড় সোহাগের, বড় সাধের স্মৃতির প্রতি। অদৃষ্টের পরিহাসে স্থবির সম্রাট্ যখন আপনার দুর্গমধ্যে আপনি বন্দী—পুত্রের অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবহারে যখন তিনি বেদনাহত, তখন তাঁহার শোকের একমাত্র শান্তিস্থল—তাঁহার সাধের স্বপন—ঐ সৌধ। বন্দী অবস্থায় দুর্গ হইতে ঐ সৌধের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি হৃদয়ে বল পাইতেন। মুমূর্ষু অবস্থায় কোন্ অজ্ঞাত, অজানা দেশে যাইবার পূর্ব্বে কবির ন্যায়, প্রেমিকের ন্যায়, সাধকের ন্যায় আপনার চিরবাঞ্ছিত—চিরসুন্দরের উদ্দেশ্যে দুই বিন্দু অশ্রু ফেলিয়া, এই সৌধের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভারত-সম্রাট্ জন্মের মত ধরাধাম হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। আর এই স্থানেই দয়িতার পার্শ্বে সম্রাট্ কবি, প্রেমিকবর, প্রেমমন্ত্রসাধক, —সংসারের দুঃখতাপ ভুলিয়া, শান্তিতে শয়ান আছেন।—আর এইখানেই—

"বঁধুর পরশে, ঘুমায় হরষে
মমতাজ সুন্দরী।"

যে লাবণ্যময়ী ললনার স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই প্রেমের মহাতীর্থে সৌন্দর্য্যের স্বপ্নস্বরূপ শ্বেতমর্ম্মরময় তাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহার জীবনকাহিনীর দুই একটি ঘটনা নীরস ইতিহাস হইলেও, আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। অর্জ্জুমন্দ বাণু বেগম ভারত-সম্রাজ্ঞী নূরজহানের ভ্রাতা আসফ্ খাঁর কন্যা। ১৬০৭

খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশবর্ষ বয়স্ক খুর্‌রমের (পরে শাহ্‌জহান) সহিত জাহাঙ্গীর অর্জ্জুমন্দ বাণুর বিবাহের কথাবার্তা স্থির করেন। পাঁচবৎসর পরে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে এই বিবাহ সংঘটিত হয়। তখন খুর্‌রমের বয়ঃক্রম ২০ বৎসর তিন মাস—অর্জ্জুমন্দ তাঁহার অপেক্ষা একবৎসর দুই মাসের ছোট ছিলেন।

পিতা জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহ্‌জহান সিংহাসন লাভ করেন। এই সময় হইতেই তিনি অর্জ্জুমন্দকে "মমতাজ মহল" নামে আখ্যাত করেন।

সত্য বটে, শাহ্‌জহান মমতাজের সহিত বিবাহের দুই বৎসর পূর্ব্বে এবং পাঁচ বৎসর পরে যথাক্রমে মুজাফর হুসেন মির্জ্জা ও শাহ নওয়াজ খাঁর কন্যার সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন; তথাপি এই দুইটি বিবাহের মূলে ভালবাসার নাম গন্ধ ছিল না—ইহা 'বা ইকৃতিজা-এ-মস্‌লিহেট' অর্থাৎ রাজনীতিক বিবাহ। শাহ্‌জহান মমতাজকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন—তাঁহার রূপ-গুণের তিনি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। মমতাজ তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছিলেন। শাহ্‌জহান কি সুখে, কি দুঃখে, যখন যে অবস্থায় যেখানে গমন করিয়াছেন—মমতাজের সঙ্গ তিনি কখনও ত্যাগ করেন নাই।

নূরজহানের মোহিনী শক্তিতে চালিত হইয়া জাহাঙ্গীর যখন পুত্রকে একে একে তাঁহার সমস্ত জাগীর হইতে বঞ্চিত করেন, তখন শাহ্‌জহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'ন ও পরে আত্মরক্ষার্থ

এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য হ'ন,—তখনও মমতাজ ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী।

ঊনবিংশ বৎসর বিবাহিত জীবনের ফলে, শাহ্‌জহানের ঔরসে মমতাজের গর্ভে ১৪টি পুত্রকন্যার জন্ম হয়; তন্মধ্যে চারিপুত্র, দারা (১৬১৫ খৃঃ), সুজা (১৬১৬ খৃঃ), আওরংজীব (১৬১৮ খৃঃ), মুরাদ (১৬২১ খৃঃ) এবং তিন কন্যা,—জঁহানারা বা বেগম-সাহেব (১৬১৪ খৃঃ), রোশনারা (১৬১৭ খৃঃ) এবং গহরারা (১৬৩১ খৃঃ) ব্যতীত অবশিষ্ট সন্তানগুলির অতি শৈশবেই মৃত্যু হয়।

ব্লক্‌মান সাহেব 'আইন-ই-আকবরীতে' লিখিয়াছেন, মমতাজ সম্রাটের নিকট হইতে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতেন।

মমতাজের অদৃষ্টে সংসারের সুখভোগ বিধাতৃবিধানে অধিক-দিন স্থায়ী হয় নাই। শাহ্‌জহান যখন খাঁ জহান লোদীর বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন, সেই সময় বুরহানপুরে রাজ্ঞী মমতাজের এক কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যা-প্রসবের কিয়ৎক্ষণ পরেই চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে (৭ই জুন, ১৬৩১ খৃঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়।

কাসিম আলি আফ্রিদির "আত্মকাহিনী"তে লিখিত আছে ঃ— "কনিষ্ঠা কন্যা দহর আরার (গহর আরা) জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে মমতাজ, গর্ভস্থিত সন্তানের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া জীবনের আশা ত্যাগ করেন এবং অবিলম্বে সম্রাট্‌কে ডাকাইলেন। তিনি কাতরস্বরে

তাঁহাকে জানাইলেন,—'ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, সন্তান গর্ভাবস্থায় ক্রন্দন করিলে মাতা কখনও প্রসবের পর বাঁচে না। হে সম্রাট্! জীবনে যাহা কিছু অন্যায় বা দোষ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন—আমি এখন মরণপথের যাত্রী। অন্তিমকালে আপনার নিকট আমার দুইটি অনুরোধ আছে—প্রতিজ্ঞা করুন তাহা পালন করিবেন।' শাহ্‌জহান প্রতিশ্রুত হইলেন। মমতাজ বলিলেন, 'মঙ্গলময় খোদা আমার গর্ভে আপনার চারি পুত্র ও তিন কন্যা দিয়াছেন; ইহাদের দ্বারাই মোগলগৌরব ও বংশরক্ষা হইতে পারিবে। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা—আপনি আমার সমাধির উপর এমন একটি অবিনশ্বর কীর্ত্তিচিহ্ন সংস্থাপন করিবেন, যাহা জগতে অদ্বিতীয় হইবে।' মৃত্যুশয্যাশায়িনী পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া শাহ্‌জহান বাষ্পজড়িত কণ্ঠে উত্তরে বলিয়াছিলেন "রাজ্ঞী! তোমার অনুরোধ দুইটিই আমি রক্ষা করিব এবং তোমার এরূপ একটি সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিব, যাহা জগতে চিরদিন অতুলনীয় হইয়া থাকিবে।—আর সেই কীর্ত্তিচিহ্ন এরূপ স্থানে সংস্থাপিত করিব যে, প্রাসাদের সকল স্থান হইতে সকল সময়ে তোমাকে দেখিতে পাই।"

উপরিউক্ত ঘটনাবলীর কথা আগরায় এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক 'পাদিশানামা'-গ্রন্থকার আব্‌দুল হামিদ লাহোরী বেগমের মৃত্যুর কথা এইরূপ লিখিয়াছেন:—"যখন মমতাজ নিজের মৃত্যুসম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হ'ন, তখন

তিনি কালবিলম্ব না করিয়া কন্যা জঁহানারা দ্বারা সম্রাট্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শাহ্‌জহান অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন। মমতাজ—মাতা ও পুত্রকন্যাদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন।"

মমতাজের মৃত্যুতে সম্রাট্‌ এক সপ্তাহকাল কোন রাজকার্য্যে যোগদান করেন নাই। তিনি বলিতেন,—"রাজ্য-শাসনকে যদি আমি পবিত্র কর্ত্তব্যকার্য্যরূপে মনে না করিতাম, ইচ্ছামত যদি ইহা পরিত্যাগ করা যাইত, তাহা হইলে আমি ফকিরী লইতাম।"

রঙ্গীন পোষাক পরিধান, বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার—এমন কি বার্ষিক অভিষেক-উৎসব ও জন্মদিন-উৎসবে নৃত্যগীতও তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। যখনই তিনি প্রিয়মহিষীর সমাধিস্থল দেখিতে গিয়াছেন, তখনই তাঁহার নয়ন বহিয়া অশ্রুনদী প্রবাহিত হইয়াছে।

বুরহানপুরের অপর পারে, তাপ্তিনদীতীরস্থ জৈনাবাদের উদ্যান-বাটিকায় প্রথমে মমতাজের মৃতদেহ রক্ষিত হয় (৭ই জুলাই, ১৬৩১ খৃঃ); পরে ডিসেম্বর মাসে তাহা শুজার তত্ত্বাবধানে আগরায় আনীত হয়।

মানসিংহের পৌত্র রাজা জয়সিংহের নিকট হইতে আগরার এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড মমতাজের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ক্রয় করা হয়। নানা দেশের শিল্প-বিশারদগণের নিকট হইতে

সম্রাট্ তাজের নক্‌সা গ্রহণ করেন। পরে যে নক্‌সাটি মনোনীত হয়, তাহার একটি আদর্শ প্রথমে কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত করা হয়।

মুকারম্মৎ খাঁ ও মীর আব্‌দুল করীমের তত্ত্বাবধানে তাজমহল নির্ম্মিত হয়। 'দেওয়ান-ই-আফ্রিদিতে' উক্ত আছে, এই তাজের নির্ম্মাণকল্পে নয় কোটী সতরলক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। সিংহল, কন্দাহার, যোধপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে আনীত কুড়ি রকমের বিভিন্ন মূল্যবান্ প্রস্তর তাজমহল-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাজের নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হয় এবং ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শেষ হয়। অতঃপর নূতন সমাধি-মন্দির তাজমহলে মমতাজকে সমাহিত করা হয়।

১৬৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারী, মমতাজের দ্বাদশ-স্মৃতি-উৎসবে, শাহ্‌জহান যখন পত্নীর সমাধিমন্দিরে গমন করেন, সেই সময়ে তিনি একলক্ষ টাকার আয়যুক্ত আগরা ও নগরচিন পরগণার ত্রিশখানি গ্রাম তাজমহলের ব্যয়ভার বহনের জন্য উৎসর্গ করেন। অধিকন্তু, সমাধির নিকটবর্ত্তী যে সমস্ত সরাই ও দোকানপসার ছিল, তাহা হইতেও যে একলক্ষ টাকা আয় হইত, তাহাও তাজমহলের জন্য ও সমাধিমন্দিরস্থ সাধুফকীরগণের ভরণপোষণে ব্যয়িত হইত।

স্লিমান সাহেব যখন সস্ত্রীক তাজমহল পরিদর্শন করেন, সেই সময়ে তিনি পত্নীকে জিজ্ঞাসা করেন—"তাজমহল দেখিয়া

তোমার কিরূপ মনে হয়?" উত্তরে শ্লিমান-পত্নী বলিয়াছিলেন —"তাজ দেখিয়া কি মনে হয় তাহা বলিতে পারি না; তবে আমার মনে ইহাই উদয় হয় যে, আমার কবরের উপর যদি এইরূপ সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়, তবে আমি কালই মরিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে বলিতে কি, আমি কেন, তাজ দেখিয়া অধিকাংশ রমণীর মনেই এই বাসনার উদয় হয়।"

শাহ্‌জহান মুমূর্ষু পত্নীর অন্তিম অনুরোধ উপেক্ষা করেন নাই। তিনি পত্নীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, জগতের সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম তাজ নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় তাঁহার প্রণয়িনীর দেহ সমাহিত করিয়া, স্বীয় প্রেম-প্রতিশ্রুতির অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

বাহ্যসৌন্দর্য্যে তাজমহল অনবদ্য হইলেও, পবিত্র দাম্পত্য-অনুরাগের নিদর্শন বলিয়া, ইহার সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে;—প্রেমের পবিত্রতীর্থ বলিয়া ভারতবাসীর ইহা বড় আদরের—বড় গর্ব্বের সামগ্রী।

তাজ দর্শন করিয়া কত জন কত কথা বলিয়াছেন; তাহার দুই চারিটি এখানে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

An extract from Bayard Taylor's Introductory Remarks:—"* * * If there was nothing else in India, this would alone repay the journey.

The distant view of this matchless edifice satisfied me that its fame is well-deserved. So pure, so glorious did it appear, that I almost feared to approach it lest the charm should be broken. * * *"

আর আমাদের কবিসম্রাট্ সার রবীন্দ্রনাথ তাজমহল দর্শন করিয়া তাঁহার অমর লেখনীমুখে যে অমৃতধারা বর্ষিত করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কবিসম্রাট্ লিখিয়াছেন :—

"হে সম্রাট্ কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিনী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ বিলাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,

ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য্যদূত যুগযুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

শনিবার রাত্রিতে আগরায় পৌঁছিয়াছিলাম। সমস্ত রবিবারটা তাজমহলের জন্যই রাখিয়া দিয়াছিলাম; প্রাতঃকালে তাজমহল,—মধ্যাহ্নে তাজমহল—অপরাহ্নকালে তাজমহল—রাত্রিতেও তাজমহল! সমস্ত দিনরাত ভরিয়া তাজমহল দেখিলাম; কিন্তু সে—

"——রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

—দেখিয়া আর আশ মিটিল না। প্রেমের বিজয়-বৈজয়ন্তী তাজমহলকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইলাম। পথে আসিতে আসিতে বারবারই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের লিখিত 'Passing of Shah Jahan'র নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে হইতে লাগিল—"Shah Jahan, retaining full consciousness to the last and gazing on the resting-place of his beloved and long-lost Mumtaz Mahal repeated the Muslim Confession of faith. A moment later he
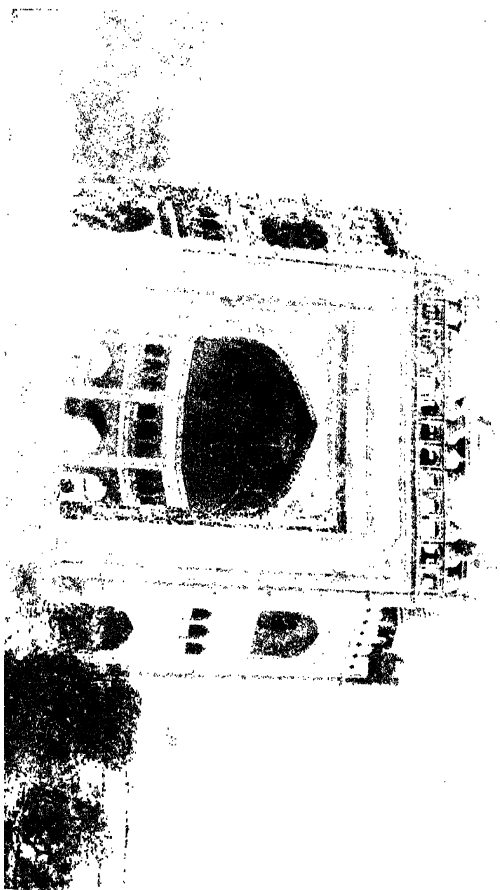
sank peacefully into eternal rest"—কি সুখের মরণ! তাজমহলের দিকে শেষদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে-করিতে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করা,—মনে করিলেও প্রাণের মধ্যে যে কি ভাবের সঞ্চার হয়, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

ফতেপুর সিক্‌রি

রবিবার রাত্রিতে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বলিলেন যে, পরদিন সোমবার প্রাতঃকালে আমার ফতেপুর সিক্‌রি দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেও দুই তিনবার আগরা গিয়াছি; কিন্তু একবারও ফতেপুর সিক্‌রি যাইবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই; যাঁহারা ফতেপুর দেখিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে উক্তস্থানের প্রশংসা করিয়াছেন।

আমার ভ্রমণের এই ব্যবস্থা হইল যে, খুব ভোরে আমার জন্য মোটর আসিবে;—এত ভোরে যে, আমরা আগরা হইতে যাত্রা করিয়া ২২ মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক যেন ঠিক সাতটার সময় ফতেপুর সিক্‌রিতে পৌঁছিতে পারি। তথাস্তু! স্থির হইল যে, চিত্রকর শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ আমার সঙ্গে যাইবেন; আর পথি-প্রদর্শক হইবেন মহারাজের একজন কর্ম্মচারী। এখানেই বলিয়া রাখি যে, মহারাজাধিরাজ বাহাদুর যাঁহাকে আমাদের

'গাইড' করিয়া দিলেন, তিনি কিন্তু আমারই মত পণ্ডিত। তিনি কোন দিন ও-মুখোও হ'ন নাই। মহারাজ আদেশ করিলেন সুতরাং তিনি 'যো হুকুম' বলিয়া সেলাম করিয়া আমাদের পথি-প্রদর্শক হইলেন। পৃথিবীতে অনেক সময়েই এমন হইয়া থাকে; কর্ম্মজগতেই হউক আর ধর্ম্মজগতেই হউক, অনেক সময়েই অন্ধ কর্তৃক অন্ধ নীয়মান হইয়া থাকে। যাক্ সে কথা।

পরদিন সোমবার সাড়ে পাঁচটার সময় মোটরচালক আসিয়া উপস্থিত হইল। 'আমরা তখনও শয্যাগত। মোটর-চালক আমাদিগকে ডাকিয়া তুলিল। তাহার নিকট শুনিলাম, একটু পূর্ব্বেই মহারাজ ঐ পথে বেড়াইতে যাইবার সময় আমাদের গৃহদ্বারে মোটর দণ্ডায়মান দেখিয়া চালককে 'জল্‌দি' করিবার জন্য আদেশ দিয়া গিয়াছেন। সংবাদটা শুনিয়া একটু লজ্জিত হইলাম; মনে হইল 'যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়সির কাজ কামাই।' আমরা যাইব বেড়াইতে, আর তাহার জন্য ভোরের বেলা তাগাদা জুড়িয়া দিয়াছেন মহারাজা বাহাদুর।

তাড়াতাড়ি কোন প্রকারে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, বহুপূর্ব্বে আনীত চা পান করিয়া ফতেপুর সিক্‌রি যাত্রা করিলাম। বাইশ মাইল পথের মধ্যে যাহা যাহা দেখিলাম, তাহাদের দফা-ওয়ারি বিবরণ যদি সংগ্রহ করিয়া দিতে যাই, তাহা হইলে প্রকাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত হইবে। সে প্রলোভন আমি এই 'দশদিনে' পদে-পদে সংবরণ করিতেছি। কি ত্যাগ-স্বীকার! তবে ফতেপুর

সিক্রিতে কি কি দেখিয়াছিলাম, তাহার একটা ছোটখাট বিবরণ দিতেছি। বলিয়া রাখা ভাল যে, এক্ষেত্রে আমাদের যিনি গাইড, তিনি আমারই মত অভিজ্ঞ, সুতরাং সিক্রিতে পৌঁছিয়া যে ভাড়াটিয়া 'গাইড' পাইয়াছিলাম, সে যাহা-যাহা বলিয়াছিল এবং দেখাইয়াছিল, তাহাই বলিতে পারি। একটা কথা কিন্তু সকলেই মনে রাখিবেন যে, আমি ঐতিহাসিক নহি—প্রত্নতাত্ত্বিক ত নহি—নহি। সুতরাং আমি বাজার-প্রচলিত ইতিহাস হইতেই আমার কথা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। শেষে যে 'দশদিন' লেখা উপলক্ষে আমি ঐতিহাসিকগণের তীক্ষ্ণ লেখনীর আঘাতের বিষয়ীভূত হইব, তাহাতে আমি মোটেই রাজি নহি। কেতাবপত্রে ফতেপুর সিক্রি সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে, তাহারই সারসংগ্রহ করিতে আসিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিলাম আমার দ্বারা এমন দুষ্কর্ম্ম কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না,—একেবারেই অসম্ভব। তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিলাম।

ফতেপুর সিক্রি সম্বন্ধে লিখিবার জন্য খানকয়েক ইংরাজী পুস্তক ওলটপালট করিতে-করিতে মনে হইল যে, বহুদিন পূর্ব্বে আমার সোদরপ্রতিম সুলেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রে ফতেপুর সিক্রি সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেইটি যদি আমি তুলিয়া দিই, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়;—আমি একরাশি বাজে বই (নবেল ছাড়া আর সবই আমাদের মত পণ্ডিতের নিকট বাজে বই) পড়া

এবং তাহার সারসংগ্রহ করার দায় হইতে অব্যাহতি পাই। সহৃদয় পাঠক এবং উদারহৃদয়া পাঠিকাগণ দেখিতে পাইতেছেন যে, আমি ইতিহাসের বোঝা কেমন করিয়া বন্ধুগণের স্কন্ধে চাপাইয়া দিতেছি। পরে ইহার আরও প্রমাণ পাইবেন। এখন ফতেপুরের ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবাবু কি বলিয়াছেন, তাহা শুনুন; আর বোঝাপড়া করিতে হয়, তাঁহার সঙ্গে করুন; —আমি খালাস!

"বহু শতাব্দীর পলিপড়া প্রান্তরের মধ্যে দেড়শত ফিট উচ্চ বালুকাময় প্রস্তরের গিরিমালার উপর ফতেপুর সিকৃরি অবস্থিত। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম পর্য্যন্ত ফতেপুর সিকৃরি প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত। এখানে রাজধানী নির্ম্মাণের ও পরিত্যাগের কারণ জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে। সে সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

আকবর শাহের সকল সন্তান শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি সপরিবারে আজমীরের প্রসিদ্ধ পীর মইনুদ্দীনের দরগায় গমন করেন। এই সুদীর্ঘ সাড়েতিনশত মাইল পথ আকবর সপরিবারে পদব্রজে অতিক্রম করেন। প্রতিদিন তিন ক্রোশ পরিমাণ পথ অতিক্রান্ত হইত। বাদশাহের অসূর্য্যম্পশ্যা শুদ্ধান্তঃবাসিনীকে লোকচক্ষুর পাপদৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার জন্য পথের উভয়পার্শ্বে কাণাৎ (পর্দা) সংস্থাপিত

হইয়াছিল; আর কঠিন ধরণীতলস্পর্শে বাদশাহের, ততোধিক বেগমের কোমল পদপল্লবতল ব্যথিত হয়, সেইজন্য সমস্ত পথ কোমল কার্পেটে মণ্ডিত হইয়াছিল। দিবসের ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া, বাদশাহ ও বেগম যেখানে বিশ্রাম করিতেন, সেখানে একটি করিয়া ইষ্টকস্তম্ভ নির্ম্মিত হইত।

দরগায় উপস্থিত হইয়া "হত্যা" দিলে রাত্রিকালে বাদশাহের প্রতি প্রত্যাদেশ হইল যে, তাঁহাকে সিকৃরির ক্ষুদ্র শৈলশৃঙ্গবাসী শেখ সেলিম চিস্তির নিকট যাইতে হইবে। এই আদেশানুসারে আকবর শাহ সেই ছিয়ানব্বই বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সাধু সেলিম চিস্তির নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, সম্রাট্-মহিষী রাজা বিহারী মল্লের কন্যার গর্ভে আকবরের যে সন্তান জন্মিবে, সেই দীর্ঘজীবী হইবে। বেগম তখন গর্ভবতী; কাজেই তাঁহার সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত আকবর সপরিবারে সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩১এ আগষ্ট তারিখে মহিষী একটি পুত্র প্রসব করিলেন; রাজ্যে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। সেই সাধুপুরুষের নামানুসারে, আকবর শাহ পুত্রের 'মির্জ্জা সেলিম' নামকরণ করিলেন। এই মির্জ্জা সেলিমই ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর নামে পরিচিত।

তখন সর্ব্বদা সাধুর অনুগ্রহ-প্রাপ্তির আশায়, আকবর নির্জ্জন সিকৃরিতেই রাজধানী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। সাধুর নির্জ্জন বাসস্থান জনকোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিল; সাধুর তপশ্চরণের

ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তাহার পর আকবর যখন সিক্‌রিতে রীতিমত দুর্গ-নির্ম্মাণের আয়োজন করিলেন, তখন সাধু বলিলেন, "যদি আমার ক্ষমতায় তোমার আর বিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার ও আমার একস্থানে বাস করা অসম্ভব। আমাকে এস্থান হইতে শান্তিতে বিদায় লইতে দাও।" এই কথা শুনিয়া আকবর বলিলেন, "তাহাই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে দাসকে অনুমতি করিলে দাসই অন্যত্র গমন করে।" তখন বৃদ্ধ সাধু আগরা সম্রাটের বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

রাজাকে লইয়াই রাজধানী; রাজার বাসস্থান-পরিবর্ত্তনে পূর্ব্ব রাজধানী শ্রীহীন হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সম্রাটের আদেশে আগরার জনহীন প্রান্তর অচিরে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল; আর বন্যার জলের মত জনস্রোত ফতেপুর সিক্‌রি হইতে সরিয়া গেল। এখনও ফতেপুর সিক্‌রিতে সমুন্নত সৌধ ও প্রশস্ত পথ তেমনই রহিয়াছে; নাই কেবল নগরের জীবন, সৌধের সৌন্দর্য্য,—মানব। এখন সে পথে আর মানব-পদধ্বনি শ্রুত হয় না, বোধ হয় যেন আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত মৃত নগর; যেন কুশ-পরিত্যক্তা অযোধ্যা—

"যে পথে প্রমদাকুল চলিত নিশায়,
মুখর নূপুর চারু বাজিত চরণে;
আপনার পথ হেরি মুখের উল্কায়
সে পথে শৃগাল ঘুরে আমিষান্বেষণে।

খোদিত রমণীমূর্ত্তি স্তম্ভের উপর
ধূলায় বিবর্ণ হ'য়ে রয়েছে এখন ;
রক্ত অসিচর্ম্ম পড়ি আছে বক্ষোপর
উরস আবরি যেন রয়েছে বসন।"

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ও আরও অনেকের মতে পানীয় জলের অভাবই আকবরের ফতেপুর ত্যাগের কারণ।

ফতেপুরের বিশেষ বিবরণ

দক্ষিণদিক দিয়া প্রবেশ করিতে প্রথমেই 'বুলন্দ দরওয়াজায়' দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফারগুসনের মতে, ভারতবর্ষে, সম্ভবতঃ জগতে, আর কুত্রাপি কোন ধর্ম্মমন্দিরের এমন মনোরম দ্বার নাই।

বুলন্দ-দ্বারের পার্শ্বে একটি প্রায় ত্রিশ ফিট গভীর স্বচ্ছসলিল সরোবর আছে। দর্শকদিগের নিকট হইতে কিছু বক্‌শিস লাভের আশায় বালকগণ ও যুবকদল প্রায় সত্তর ফিট উচ্চ মসজিদ হইতে সেই সরোবর-সলিলে লাফাইয়া পড়ে। বুলন্দ-দ্বারের উপর আরোহণ করিলে, পরিত্যক্ত নগরী ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রান্তরের দৃশ্য নয়ন-সমক্ষে চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়।

দ্বার অতিক্রম করিয়া সুবৃহৎ চত্বরে প্রবেশ করিতে হয়। এই প্রাঙ্গণের পশ্চিমাংশে বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন একটি মসজিদ অবস্থিত। প্রাঙ্গণের অপর তিন পার্শ্বেই

তীর্থযাত্রীদিগের জন্য রক্তপ্রস্তরবিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। মসজিদটি তিনটি শ্বেত-মর্ম্মর-নির্ম্মিত গম্বুজের মুকুটে মণ্ডিত। মসজিদের দুই পার্শ্বের অংশ যাত্রীনিবাসের ন্যায় রক্তপ্রস্তরে গঠিত। মসজিদের মধ্যাংশ খিলান করা ও হর্ম্ম্যতল নানা-প্রকার জ্যামিতির চিত্রের মত চিত্রিত, সুন্দরীকৃত। মসজিদের প্রধান খিলানে লিখিত খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। বুলন্দ-দরওয়াজা ইহারও বহুদিন পরে (১৬০১ খৃঃ) নির্ম্মিত হয়। এই মসজিদের পশ্চাতে শেখ সেলিম চিস্তির শিশুপুত্রের সমাধি ও জাহাঙ্গীরের সূতিকাগৃহ। এখানে বসিয়া বৃদ্ধ সাধু আপনার ছাত্রদিগকে শিক্ষা-দান করিতেন।

চত্বরের উত্তরাংশে দুইটি সমাধি অবস্থিত। একটি রক্তপ্রস্তরবিনির্ম্মিত, অপরটি অমল-ধবল মর্ম্মরে গঠিত। ইহার বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত ধবল প্রস্তরময় দেহ দূর হইতে সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যবহুল চিক্কণ বস্ত্রখণ্ডবৎ প্রতীয়মান হয়। এই সমাধিটি শেখ সেলিম চিস্তির। এই সমাধি-মন্দিরাভ্যন্তরে শুক্তি-খচিত মর্ম্মর-আচ্ছাদনতলে তাঁহার দেহাবশেষ প্রোথিত। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, এবং ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে এই সমাধি-নির্ম্মাণ শেষ হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে এই মন্দির নানা বহুমূল্য প্রস্তরে সুশোভিত ছিল। জাঠগণ সেই রত্নরাজী লুণ্ঠন করিয়া মন্দির শ্রীহীন করিয়া যায়। অপর সমাধিটি সেলিমের

পৌত্র—জাহাঙ্গীরের মন্ত্রী ইস্‌লাম খাঁর। অপর সমাধিটির সহিত তুলনায় ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে।

চত্বরের পূর্ব্বাংশে ষাটফিট উচ্চ বাদশাহী দ্বারপথে বাহির হইয়া সোপানাবলি অতিক্রম করিলে, আবুল ফজলের ও তাঁহার ভ্রাতা ফৈজীর সুগঠিত নিবাসগৃহে উপস্থিত হওয়া যায়। এই গৃহ এক্ষণে বিদ্যালয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার পরেই আকবরের প্রকৃত প্রাসাদাবলী। প্রথমেই অশ্বশালা। এখানে শতাধিক অশ্ব ও বহুসংখ্যক উষ্ট্র রাখিবার বন্দোবস্ত আছে; সাজসরঞ্জাম সকলই প্রস্তরের, তাই এতদিন পরে আজও কিছু নষ্ট হয় নাই!

তৎপরে যোধাবাইয়ের মহল। একটি অত্যুচ্চ কারুকার্য্যবহুল দ্বার অতিক্রম করিয়া এই মহলে প্রবেশ করিতে হয়। উত্তরে দক্ষিণে প্রস্তরের ছাদবিশিষ্ট অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ; এগুলি গাঢ় নীলবর্ণে অতি সুন্দররূপে মিনা করা। প্রাসাদ রক্ত-প্রস্তরে গঠিত; কাজেই এই বর্ণবৈচিত্র্য যে অত্যন্ত নয়নারাম, সে কথা বলা বাহুল্য।

যোধাবাইয়ের প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে কতকগুলি অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ; সে সকলের মধ্যে মন্ত্রিবর বীরবলের গৃহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৃহনির্ম্মাণে লৌহ বা কাষ্ঠ একেবারেই ব্যবহৃত হয় নাই; কেবল রক্তবর্ণ বালুপ্রস্তরেই সমগ্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। গৃহের সর্ব্বাঙ্গ অতি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত;

—দেখিলে প্রস্তরের গঠন বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় যেন কোন জাপানী শিল্পী হস্তিদন্তের উপর নানা চিত্র খোদিত করিয়াছে। গৃহের উপরিতল কয়টি গম্বুজে শোভিত। এই গৃহ এক্ষণে দর্শকদিগের বিশ্রামাগারে পরিণত হইয়াছে।

প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে আর একটী প্রাসাদ আকবরের খৃষ্টান বেগম মরিয়মের প্রাসাদ বলিয়া লোকে অভিহিত করিয়া থাকে। এই প্রাসাদের দ্বারের উপরিভাগ বাইবেলে বর্ণিত নানা চিত্রে সুশোভিত; কিন্তু আকবরের পরবর্ত্তী গোঁড়া মুসলমানদিগের কৃপায় এখন তাহার অধিকাংশই বিনষ্টপ্রায়, শ্রীহীন। কেহ কেহ আকবরের খৃষ্টান-মহিষীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে চাহেন না; কিন্তু যখন তাঁহার খৃষ্টান মহিষী থাকা না থাকা উভয় পক্ষেই উপযুক্ত প্রমাণের অভাব, তখন এমন একটা মধুর জনশ্রুতিতে অবিশ্বাস করিয়া লাভ কি? বীরবলের ও মরিয়ম বেগমের গৃহের মধ্যে উদ্যানে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র মসজিদ অবস্থিত; বোধ হয়, অন্তপুরচারিণীবৃন্দ এখানে উপাসনা করিতেন।

ইহারই নিকটে প্রসিদ্ধ পঞ্চমহল। ইহার প্রথমতলে ছাপান্নটি স্তম্ভ; তন্মধ্যে কোনও দুইটির গঠন একরূপ নহে। দ্বিতলে পঁয়ত্রিশটি, ত্রিতলে পনেরটি ও চতুর্থতলে আটটি স্তম্ভ। সর্ব্বোপরি চারিটি স্তম্ভের উপর একটি গম্বুজ। এই পঞ্চমহলের কোন দুইটি স্তম্ভের মাতলায় কারুকার্য্য একরূপ নহে। এই সুবৃহৎ

পঞ্চমহল—ফতেপুর।
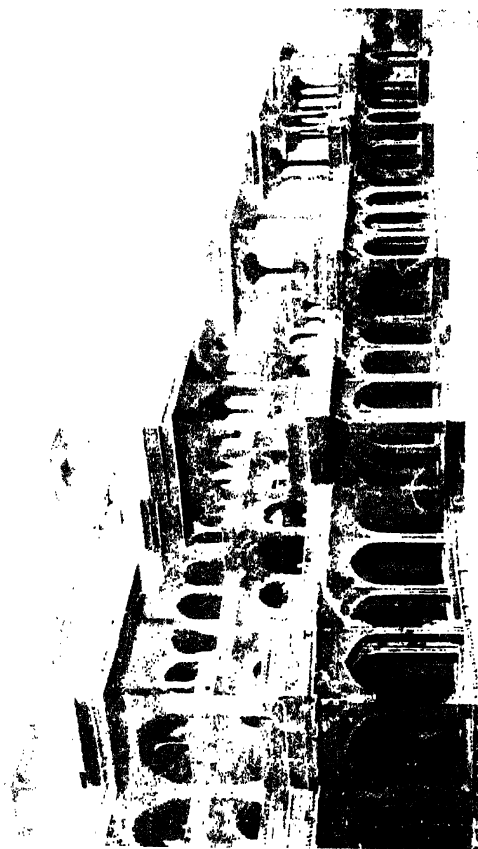
গৃহ শুদ্ধান্তশোভিনীদিগের সমীর-সেবনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গৃহের দুইটি স্তম্ভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য; একটি স্তম্ভ দুইটি করিকরে বিজড়িত; অপরটিতে একজন মনুষ্য বৃক্ষ হইতে ফল চয়নে রত। কথিত আছে, শেষোক্তটি কোন বৌদ্ধ-মন্দির হইতে আনীত।

"খাসমহল" একটি প্রস্তরমণ্ডিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ-মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সরোবর,—পূর্ব্বে ইহাতে কয়েকটি ফোয়ারা ছিল। ইহার দক্ষিণে আকবর শাহের শয়নমন্দির। প্রকোষ্ঠভিত্তি ফার্সী রচনায় শোভিত; বলা বাহুল্য, তন্মধ্যে অনেকগুলিই বাদশাহের প্রশংসাসূচক।

এই খাসমহলের এক কোণে আকবরের তুর্কিপত্নীই স্তাম্বুলী বেগমের আবাসগৃহ। সমস্ত ফতেপুর সিক্‌রিতে এরূপ সুদৃশ্য প্রাসাদ অল্পই আছে। প্রাসাদাঙ্গে পশুপক্ষী প্রভৃতি বিবিধ প্রাকৃতিক চিত্র খোদিত। একাংশে একটি অতি সুন্দর আরণ্য-দৃশ্য চিত্রিত। স্তম্ভগুলিও নানা প্রকার খোদিত পত্রপুষ্পে শোভিত।

আর একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণপ্রান্তে "দেওয়ান-ই-খাস" অবস্থিত। হর্ম্ম্যতলে দশপঁচিশ খেলার ছক। এই অদ্ভুত অট্টালিকা-নির্ম্মাণের কোনও কারণই দৃষ্ট হয় না। বোধ হয়, ইহা একটি costly architectural freak মাত্র। বহির্দ্দেশ হইতে অট্টালিকাটি দ্বিতল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই সে ভ্রম অপনোদিত হইয়া যায়। হর্ম্ম্যতল হইতে

ছাদ পর্য্যন্ত কোনও ব্যবধান নাই। গৃহের মধ্যস্থলে একটি সুবিশাল স্তম্ভ। স্তম্ভগাত্রে নানা চিত্র খোদিত। স্তম্ভশির হইতে প্রকোষ্ঠের চারি কোণ পর্য্যন্ত এক-একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতুবৎ পথ; প্রতি পথের শেষ হইতে হর্ম্মতল পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী নামিয়া আসিয়াছে।

ইহার পর স্তম্ভশোভিত প্রাঙ্গণমধ্যে "দেওয়ান-ই-আম।" অনেকে অনুমান করেন যে, ইহা বন্যপশুর ক্রীড়া-দর্শন ও তদ্রূপ অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

ফতেপুর সিক্‌রিতে আর একমাত্র উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা "আঁখমিছৌলি।" প্রদর্শকগণ বলেন, এখানে স্বয়ং আকবর শাহ পারিষদবর্গের সহিত "কাণামাছি" খেলা করিতেন। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ বলেন, উত্তর-কালে সমগ্র ভারতভূমি যাঁহার ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল, সেই জাহাঙ্গীরের বাল্যক্রীড়ার জন্য এ গৃহ নির্ম্মিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা প্রাসাদের ধনাগার ছিল। দ্বারের গঠন দেখিলে এই শেষোক্ত মতই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। এই অট্টালিকার সম্মুখেই জৈনধরণে নির্ম্মিত সুন্দর ক্ষুদ্র হর্ম্ম্য।

এই প্রাসাদসমূহের বহির্দ্দেশে "হাতিপোল"। দুইটি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তীর শুণ্ডদ্বয় জড়িত হইয়া এই দ্বার প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার এই নাম। কিন্তু আওরংজীব মুসল-

মানসুলভ প্রতিমাপূজাবিদ্বেষের আতিশয্যে হস্তিদ্বয়ের মুণ্ড-চ্ছেদ করেন। যোধাবাইয়ের মহল হইতে হাতিপোলের উপরিস্থিত গৃহে আসিবার একটী আবৃত পথ আছে।

হাতিপোলের নিকটেই "হীরণ মিণার"। ইহার নিকট দিয়া মৃগাদি তাড়িত হইলে বাদশাহ তাহাদের শিকার করিতেন। ইহা সুরম্য নহে।

ফতেপুর সিকৃরিতে এই সকল অট্টালিকা ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদের প্রাণতোষিণী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অট্টালিকা অনেক বর্ত্তমান।

আকবর ফতেপুর সিকৃরিতে দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে দুর্গ সম্পূর্ণ না হইবার কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হাতিপোলের নিকটেই সেই অসম্পূর্ণ দুর্গের নমুনা—"সাঙ্গিয়া বুরুজ"। এই বুরুজের নিকটেই রাজদরবারে পণ্যবিক্রয়-লোলুপ বণিকদিগের জন্য সরাই।

এখন এই সকল প্রাসাদ শ্মশানতুল্য নির্জ্জন। মোগল-গৌরবের এই প্রাণহীন অবশেষে আছে কেবল পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতি। এখন এই বিজন প্রাসাদে শেখ সেলিম চিস্তির বংশধর বলিয়া পরিচিত কতকগুলি প্রদর্শক বাস করে।"

ফতেপুর সিকৃরির ইতিহাস বলা হইল; এক্ষণে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলিবার কিছু প্রয়োজন আছে কি? আমার ত মনে হয় না। তবে দুই একটী সামান্য কথা বলা দরকার মনে করিতেছি। প্রথম কথা এই যে, দেওয়ান-ই-খাসে যেখানে বসিয়া বাদশাহ

অমাত্যবর্গ লইয়া মন্ত্রণা করিতেন, আমি পরম উল্লাসে সেই-খানে বসিয়াছিলাম। কিন্তু অমাত্যবর্গ কোথায় পাইব? সেই স্থানে আমার সঙ্গী মহাশয় এবং পথিপ্রদর্শক ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না; সুতরাং দেওয়ান-ই--খাসে সম্রাটের আসনে বসিয়াও বাদশাহগিরী করা আমার অদৃষ্টে হইল না; লাভের মধ্যে এই হইল যে, আমার বহুদিনের সঙ্গী রৌদ্রোত্তাপ-নিবারক চস্‌মাখানি সেইস্থানে ফেলিয়া আসিলাম। বাদসাহের আসনে কি আর চক্ষে ঠুলী দিয়া বসা যায়! তাই আমি আমার চস্‌মাখানি খুলিয়া আসনের পার্শ্বে রাখিয়াছিলাম। তাহার পর সেই নির্জ্জন দেওয়ান-ই-খাসে বাদশাহগিরী করার পর যখন সেই স্থান ত্যাগ করি, তখন স্থানমাহাত্ম্যেই হউক বা আসনের মাহাত্ম্যেই হউক, সামান্য চস্‌মাখানির কথা আর মনে হইল না। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া চস্‌মার কথা যখন মনে হইল, তখন আবার সেই ২২ মাইল যাতায়াত করা অপেক্ষা চস্‌মার মায়া ত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করিলাম। পাঁচ মিনিটের জন্য বাদশাহ-গিরী করিতে গিয়া ছয়টাকা মূল্যের চস্‌মাখানি হারাইয়া আসিলাম।

বাসায় আসিবার পর শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের নিকট পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল; কোথায় কি দেখিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটির কথা বলিতে হইয়াছিল; সুধু বলি নাই আমার চস্‌মা হারাইবার গল্পটা,—সেটা তখন গোপন করিয়াছিলাম;

এখন এই 'দশদিনের' কল্যাণে আমার পাঁচ মিনিটের আবু-হোসেনগিরির কথাটা আর গোপন করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না।

সেকেন্দ্রা

সোমবারের প্রাতঃকালটা ত গেল ফতেপুর সিক্‌রিতে; অপরাহ্ণকালে গেলাম সেকেন্দ্রায়। ওটি আর এ যাত্রায় বাকী থাকে কেন? পূর্ব্বে যদিও দুই তিনবার সেকেন্দ্রায় গিয়াছিলাম; তবুও আগরায় আসিয়া সেকেন্দ্রায় না যাওয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়াই মনে হইল।

এবার সঙ্গী হইলেন শ্রীমান ললিতমোহন ও শ্রীমান রামেশ্বর-প্রসাদ। আগরায় আসিয়া প্রায় সকল রকম যানেই চড়া হইয়াছিল; হিসাব করিয়া দেখিলাম গো-যান এবং টমটমই বাকী আছে—এক্কায় চড়িয়াছিলাম। গো যান আরোহণের কোনই সম্ভাবনা দেখিলাম না; কাজেই টমটমকেই এবেলা যানরূপে গ্রহণ করা স্থির করিলাম। আদেশমত একখানি টমটম আসিয়া হাজির হইল। আমরা সেকেন্দ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলাম; আগরার রাজপথের প্রচুর ধূলিরাশি মহানন্দে আমাদিগকে অভিনন্দন করিতে লাগিল।

এইবার আবার ইতিহাস বলিতে হইবে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ

স্থানগুলির ঐ একটা মহৎ দোষ; সুধু এটা দেখিলাম, ওটা দেখিলাম, বাঃ বেশ, ইত্যাদি বলিলে আজকালকার দিনে চলে না;—সে সকল স্থানের কোষ্ঠী-ঠিকুজী দিতে হয়। কাজেই আমাকেও নানা স্থান হইতে ধার করিয়া ইতিহাস বলিতে হইতেছে। কারণ, সেকেন্দ্রার ইতিহাস না বলিলে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নামঞ্জুর—এক নাবালক ঐতিহাসিক এই মত দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিলেন। দশজনের মন রক্ষা করাই যখন এই বৃদ্ধবয়সে সঙ্কল্প করিয়াছি, সাবালকের কথাই হউক আর নাবালকের কথাই হউক, আমাকে কাজেই সেকেন্দ্রার ইতিহাস একটু বলিতেই হইতেছে। অতএব আপনারা 'যথাযোগ্য অধৈর্য্য সম্বল করিয়া' এই বহুবার-বহুজন-কথিত ইতিহাসের পুনরুক্তি শ্রবণ করুন।

সেকেন্দ্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোগল-সম্রাট্ আকবর চিরনিদ্রায় মগ্ন। এই সমাধিমন্দিরের ইতিহাস সম্বন্ধে এবং কোন্ সময়ে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় ও কবে তাহা সমাপ্ত হয়, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। বর্ত্তমানে Ferguson সাহেবের সিদ্ধান্তকেই অনেকে গ্রহণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই সমাধিমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আকবর স্বয়ং আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যেই (১৬০৫-১৬১৫ খৃঃ) ইহার প্রবেশদ্বারগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। * Ferguson সাহেবের ন্যায়

---

* Hist. East. and Ind. Arch. (1876), pp. 583 ; 588, note I.
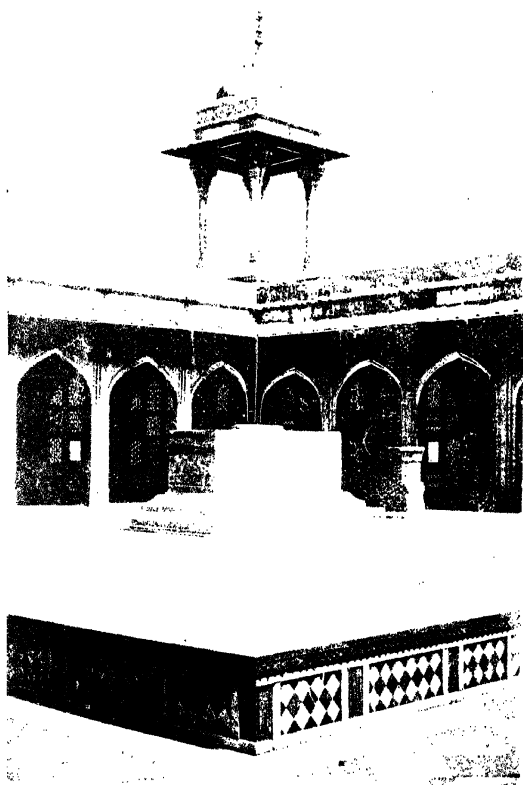
স্মিথ সাহেব * এবং Grigg সাহেবের গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা ভূমিকা-লেখকও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। † ইঁহাদের মতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে এই সমাধি-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়; কীন্ সাহেব (১) ও হ্যাভেল সাহেবও (২) এই মত প্রচার করিয়াছেন।

অপরপক্ষে Dr. Fuhrer বলেন, "Ferguson ভ্রমক্রমে এই সমাধিকে আকবরের নির্ম্মিত বলিয়াছেন; জাহাঙ্গীর ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" (৩)

এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ গবেষণা করিতে চাই। পাণ্ডিত্য-প্রকাশের এমন সুযোগ কি ত্যাগ করিতে আছে? আপনারা অবধান করুন। যে সকল মহারথীর নাম করিলাম, তাঁহাদের কাহার কথা সত্য, তাহা এতদিন পরে স্থির করা যায় কি না, তাহার একটু চেষ্টা করিলে কি বিশেষ অপরাধ হইবে?

---

* Colour Decorations in Moghul Arch. E. W. Smith (1901), pp. 2, 20.

† One hundred Photographs and Drawings of Historical Buildings in India (1896) p. 1

(১) Handbook to Agra and its Neighbourhood (1902), p. 73.

(২) Agra and the Taj (1904), pp. 25, 77,

(৩) Ancient Monuments in the N. W. P. Arch. Sur. Ind

যে সমস্ত পর্য্যটক প্রথমে হিন্দুস্থানে আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উইলিয়ম ফিন্‌চ অন্যতম। ফিন্‌চ ১৬১১ খৃষ্টাব্দে আকবরের এই সমাধি পরিদর্শন করিয়া ইহার একটি বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন ইহা দেখিয়াছিলেন, তখন ইহার অবস্থা প্রায় বর্ত্তমানের অনুরূপই ছিল; কেবল প্রবেশ-দ্বারগুলির মধ্যে তখন একটি মাত্র নির্ম্মিত হইতেছিল। ফিন্‌চ লিখিয়াছেন "nothing were finished as yet, after *Tenne yeares* work" * (ইংরাজী বানান তাঁহাদেরই, আমার নহে) সেই বর্ষেই কাপ্তেন উইলিয়ম হকিন্স আকবরের সমাধির একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—"It hath beene this *fourteene yeares* a building, and it is thought it will not be finished these seven yeares more, in ending gates and walls, and other needfull things, for the beautifying and setting of it forth." †

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে পিতার সমাধি-মন্দির পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্ম-কাহিনী 'Wakiat-i-Jahangiri'তে এ বিষয়ে লিখিয়াছেন—

"১৭ই মঙ্গলবার (কোন মাসের উল্লেখ নাই) আমি পদব্রজে

* **Purchas his Pilgrimes, 1. IV. 440 reprint, Vol. IV. 75**

† **Ibid I II 224 ; reprint 11?. 51**

পিতার সমাধি-মন্দির দেখিতে যাই।……ইহা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার মনোমত বোধ হইল না। আমার ইচ্ছা ছিল,—ইহা এরূপ সুরম্য সৌধ হইবে যে, পর্য্যটকগণ যেন ইহা দেখিয়া না বলিতে পারেন যে, জগতে তাঁহারা এরূপ আর কোন সৌধ কখন দেখিয়াছেন। যখন ইহার নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছিল, তখন হতভাগ্য খসরুর বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য আমি লাহোর গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ইতোমধ্যে নির্ম্মাণকারিগণ, যে আদর্শে ইহা নির্ম্মাণ করিবার কথা ছিল, তাহার ব্যতিক্রম করিয়া তাহাদের নিজ অভিরুচি-অনুযায়ী ইহা নির্ম্মাণ করে। এইরূপে সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, এবং এই নির্ম্মাণকার্য্যে তিন-চারি বৎসরকাল গিয়াছে। যে অংশগুলি আপত্তিজনক বোধ করিয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য সুনিপুণ নির্ম্মাণকারীদের আদেশ করিলাম। এইরূপে অল্পে অল্পে চারিপার্শ্বে সুন্দর উদ্যান-পরিশোভিত এক বিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইল। শ্বেত প্রস্তরের Minaretযুক্ত এক সুবৃহৎ দ্বারও নির্ম্মিত হইল।" *

বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ যে এই সময়ে বাজার-গুজব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে; কারণ তাহা না হইলে, একই বর্ষে দুইজন পর্য্যটক, সেকান্দ্রার নির্ম্মাণ-

---

* Elliot Muh. Hist. VI 319-20.

প্রসঙ্গে একজন দশ বৎসর, অপর জন চৌদ্দ বৎসরের উল্লেখ করি-তেন না। অপরপক্ষে, যে সমস্ত গ্রন্থ জাহাঙ্গীরের আত্ম-কাহিনী বলিয়া পরিচিত, তন্মধ্যে 'Wakiat-i-Jahangiri'কেই Elliot ও Dowson সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে,—সেকান্দ্রার নির্ম্মাণকার্য্য আকবর আরম্ভ করেন নাই,—জাহাঙ্গীর করিয়া-ছিলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীর ব্যস্ত থাকায় নির্ম্মাণকার্য্যের ভার তিনি নির্ম্মাণকারীদের উপরেই ন্যস্ত করিয়াছিলেন,—এবং রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১৬০৯ খৃঃ) তিনি ইহা পরিদর্শন করিবার পর, কয়েকজন সুদক্ষ নির্ম্মাণকারীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই সমাধির অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। ফিন্‌চ ১৬১১ খৃষ্টাব্দে যখন ইহা দেখেন, তখন ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছিল এবং একটি প্রবেশদ্বারও নির্ম্মিত হইতেছিল।

প্রধান প্রবেশদ্বারে যে দুইটী খোদিতলিপি আছে, তাহা হইতে এই সমাধি-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য কোন্ সময়ে সমাপ্ত হয়, তাহা জানা যায়। উদ্যানপার্শ্বে যে লিপিটী আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীর রাজত্বের ৭ম বর্ষে (নৌরোজ—১৭ই মার্চ্চ ১৬১২) ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করেন। ঐ স্থানে অপর যে লিপিটী আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৮ম বর্ষে (নৌরোজ ৮ই মার্চ্চ ১৬১৩) ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়। কাজেই ১৬১৩-১৪

খৃষ্টাব্দে বা নির্ম্মাণারম্ভকাল হইতে ৮ বৎসরের মধ্যে এই সমাধি-মন্দিরের সমস্ত নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল।

ফিন্‌চ ও হকিন্‌স উভয়েই প্রতিদিন তিন হাজার লোককে সেকান্দ্রা-নির্ম্মাণকার্য্যে রত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। যে সমস্ত প্রধান রাজমিস্ত্রী ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল Calligraphist আব্‌ডুল হক্‌ সিরাজী ব্যতীত আর কাহারও নাম জানিতে পারা যায় না।

কীন্‌ লিখিয়াছেন, "এই সৌধ নির্ম্মাণ করিতে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।" * কিন্তু তিনি কোথা হইতে এই সংবাদটী পাইলেন, তাহার কোন নজীর উদ্ধৃত করেন নাই।

'ওয়াকিয়তে জাহাঙ্গীরিতে' লিখিত আছে—"এই সুবৃহৎ অট্টালিকার নির্ম্মাণকল্পে ইকাকের ৫০,০০০ তুমান এবং তুরাণের ৪৫ লক্ষ খানি + ব্যয়িত হইয়াছিল। মোগল সম্রাট্‌গণের মুদ্রার মধ্যে 'তুমান' ও 'খানি' আছে বলিয়া মনে হয় না; ইহা হয় ত তুর্ক বা পারস্যরাজগণের মুদ্রা হইবে; কাজেই ইহা কত ভারতীয় মুদ্রার সমতুল্য, তাহা বলিতে পারিলাম না।

কাপ্তেন হকিন্‌স লিখিয়াছেন যে, প্রতি বৎসরই আকবরের মৃত্যুদিনে সেকান্দ্রার সমাধি-মন্দিরে ভোজের আয়োজন হয়। তিনি লিখিয়াছেন—Upon this day there is great store

* Handbook p. 43

\+ Elliot, V1, 320

of victuals dressed and much money given to the poore." এই ভ্রমণকারীর মতে জাহাঙ্গীরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি ও তাঁহার সন্তানসন্ততিবর্গ এইস্থানে সমাহিত হইবেন ; কিন্তু জাহাঙ্গীর লাহোরে 'শাহ্দারায়', শাহ্জাহান আগরার তাজে এবং আওরংজীব ইলোরা গুহার সন্নিকটে সমাহিত হন! ইহাই সেকেন্দ্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে সেকেন্দ্রার এই সমাধি-ভবন অতি যত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সমাধি-মন্দিরের দ্বারবান আমার সঙ্গী শ্রীমান ললিতের বিশেষ পরিচিত। এই বৃদ্ধ দ্বারবান বহুদিন এই কার্য্য করিতেছে; সে অনেক ইতিহাস বলিতে লাগিল। তাহার ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বা স্বকপোলকল্পিত কিছুই পাইলাম না। সে আমাদিগকে সমস্ত স্থান দেখাইল। অবশ্য তাহার সাহায্য না পাইলেও আমরা সমস্ত স্থানই দেখিতে পারিতাম, কারণ আমি নূতন যাত্রী নহি, আমার সঙ্গীও নূতন নহেন; তবুও এই বৃদ্ধ পথিপ্রদর্শককে ক্ষুণ্ণ করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

বাদশাহের সমাধি একখানি সুন্দর রেশমী আস্তরণে আবৃত রহিয়াছে; আস্তরণখানিতে সাচ্চার কাজ করা আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোগল বাদশাহের সমাধি-আচ্ছাদনের জন্য দুই-খানি আস্তরণ দান করিয়াছেন। আমরা যেখানি দেখিলাম,

সেখানি সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য; বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে ব্যবহারের জন্য যেখানি প্রদত্ত হইয়াছে, সেখানি বহুমূল্য। আমরা যেদিন গিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে যুক্ত-প্রদেশের ছোটলাট এবং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর একসঙ্গে সেকেন্দ্রায় গিয়াছিলেন; সেই সময় সেই উৎকৃষ্ট আস্তরণখানির দ্বারা সমাধি আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল। আমরা সাধারণ যাত্রী; আমরা আর সে আস্তরণ দেখিতে পাইলাম না। সমাধি-মন্দিরে আলো-প্রদানের জন্যও বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর একটী বহুমূল্য আলোকাধার প্রদান করিয়াছেন। সেটী আমরা দেখিতে পাইলাম।

অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ভ্রমণ করিয়া সম্রাটের সমাধিকে সেলাম করিয়া আমরা সেকেন্দ্রা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম এবং রাত্রিতে অপরাহ্নকালের ভ্রমণ-বিবরণ যথারীতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে জ্ঞাপন করিয়া সে রাত্রির মত বিশ্রাম করিতে গেলাম। সোমবারের কথা শেষ হইল।

কৈলাস

মঙ্গলবার—আজ রাত্রিতে আমরা আগরা ত্যাগ করিব। শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজের ব্যবস্থা অনুসারে আজ আমরা সকলে কৈলাসে গমন করিব; মহারাজাধিরাজ বাহাদুরও আমাদের

সঙ্গী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কৈলাস-দর্শনই আমার এবার আগরা-আগমনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য; এই কৈলাস দেখাইবার জন্যই বর্দ্ধমানাধিপতি আমাকে সঙ্গী করিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে —তখন আমি আর এক মানুষ ছিলাম—সেই সময় একবার আমার মাথায় খেয়াল চাপিয়াছিল যে, দেবাদিদেব মহেশ্বরের কৈলাস দর্শন করিতে যাইব। তাই উদ্ভ্রান্তচিত্তে হিমালয়ের মধ্যে কৈলাসের পথ খুঁজিয়াছিলাম। তখন মনে করিয়াছিলাম, শরীরে শক্তি আছে; মৃত্যুর ভয় নাই; সুতরাং 'আমি' চেষ্টা করিয়া কৈলাস-ধামে যাইব;—প্রকাণ্ড একটা 'আমি'র অহঙ্কারে, দর্পে অধীর হইয়া, 'আমি'কে পথিপ্রদর্শক করিয়া কৈলাসে যাইব। হায়, তুচ্ছ, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র 'আমি'! সেই 'আমিত্বের' দর্প যখন চূর্ণ হইয়া গেল, অভ্রভেদী হিমালয় যখন তুষার-প্রাচীর দ্বারা পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম—পথ মিলিল না। তখন যদি বুঝিতে পারিতাম যে,যে পাথেয় লইয়া আমি কৈলাস-দর্শনে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহা অতি অকিঞ্চিৎ-কর,—তাহা সম্বল করিয়া ও-পথে যাওয়া যায় না,তাহা হইলে হয় ত জীবনের গতি ফিরিয়া যাইত, হয় ত প্রকৃত পাথেয় মিলিত, হয় ত পরে কৈলাস দর্শন হইত! কিন্তু তাহা যে হইবার নয়; তাই একেবারে ফিরিয়া আসিলাম,—একবার কাতরপ্রাণে কৈলাসে-শ্বরকেও ডাকিলাম না।

সে কৈলাস দর্শন হইল না। এ জন্মে হইল না;—কবে হইবে,

কত যুগযুগান্ত, জন্মজন্মান্তর পরে হইবে, কে জানে? সেইজন্যই বহুকালপরে মহারাজাধিরাজ সে দিন যখন কৈলাস দর্শন করাইবার জন্য আমাকে সঙ্গী করিতে চাহিলেন, তখন সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া আমি তাঁহার সঙ্গী হইলাম। আমার যে পাথেয় নাই, তাহা আমিও জানিতাম, তিনিও জানিতেন; কিন্তু আমি এবার পাথেয় সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হই নাই; সে ভার যিনি গ্রহণ করিলেন, তিনি তাঁহার রাজভাণ্ডারের অবস্থা বুঝিয়াই আমার ভার লইয়াছিলেন;—আমি ব্যস্ত হইব কেন?

আমার একটা কথা বড়ই মনে হইয়াছিল; সে কথাটা এখানে বলিয়া রাখি। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আমাকে যখন 'কৈলাস দর্শনে' যাইবার কথা বলিয়াছিলেন, তখন আমার মনে বড়ই একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। যখন আমি সব ছাড়িয়া, কম্বল-সম্বল করিয়া হিমালয়ে গিয়াছিলাম;—যখন শারীরিক কষ্ট যথেষ্ট উপেক্ষা করিয়াছিলাম;—যখন নিতান্ত দীন-দরিদ্রের বেশে কৈলাস-দর্শনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলাম; যখন একটী পয়সাও সম্বল ছিল না; তখন আমার অদৃষ্টে কৈলাস-দর্শন হইল না; আর এতকাল পরে, এই ঘোর-বিষয়াসক্ত, এমন স্বার্থপর, এত কলুষকলঙ্কিত আমার অদৃষ্টে কৈলাস-দর্শনের সুযোগ হইতে চলিল কেন? সুধু কি সুযোগ,—একেবারে রাজযোগ! আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, তখন কৈলাস হিমালয়ের অপর-পারে ছিল; তখন কৈলাসের পথরোধ করিয়া নগাধিরাজ হিমালয় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; তখন চিরতুষাররাশি

আমার গমনের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল ; আর এখন কি না সেই কৈলাস হিমালয় ত্যাগ করিয়া আগরার অদূরে যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হজরত মহম্মদ পর্ব্বত-সমীপস্থ না হওয়ায় পর্ব্বতই না কি মহম্মদের সমীপস্থ হইয়াছিলেন ! হজরত মহম্মদের নিকট পর্ব্বত আসিতে পারে—মহম্মদ যে মহাপুরুষ ! কিন্তু আমি কে ? আমি সংসারাসক্ত, নরকের কৃমিকীট, স্বার্থের দাসানুদাস ;—আমার জন্য কৈলাস আসিবে কেন ? আসিবে কেন, আসিল কেন, তাহা জানি না ; কিন্তু আমি কৈলাস-দর্শনের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়াই মহারাজাধিরাজের সঙ্গী হইয়াছিলাম।

আজ মঙ্গলবার সেই কৈলাস-দর্শনে যাইব। পূর্ব্বদিন রাত্রিতেই সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছিল। রাত্রিশেষে মহারাজের অনুচরগণ কৈলাসে গমন করিবে ; তাহারা সেখানে আমাদের আহারের আয়োজন করিবে। মহারাজ এবং আমরা সকলে কৈলাসে সেদিন চড়ুইভাতি করিব। প্রাতঃকালে উঠিয়াই মহারাজ এক মোটরে কৈলাসে যাইবেন ; আমি এবং আমার সঙ্গী মহারাজের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমান ললিতমোহন দাস, মহারাজের চিকিৎসক শ্রীমান নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মহারাজের চিত্রকর শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ—এই চারিজন দ্বিতীয় মোটরে যাইব।

কৈলাস দেখিতে যাইব, বহুদিনের আশা-পূর্ণ হইবে, এই সমস্ত কথা ভাবিতে-ভাবিতেই রাত্রি কাটিয়া গেল। ঐ বুঝি রাত্রি শেষ

হইল, ঐ বুঝি প্রভাতের পাখী ডাকিল, ' ঐ বুঝি আমাদের মোটর আসিল ;—এই রকম উদ্বেগে আমি সারারাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা হয়, তাহাই হইল ; ভোরের সময় আমি ঘোর তন্দ্রামগ্ন হইলাম। শ্রীমান ললিত-মোহন ও ডাক্তার নন্দলাল প্রস্তুত হইয়া আমার বাসায় আসিয়া দেখেন, আমি শয্যাত্যাগ করি নাই। ডাক্তার নন্দলাল সুগায়ক ; তিনি তখন আমার নিদ্রাভঙ্গের জন্য গান ধরিলেন—

"হারে রে, রে, রে রে উঠরে কানাই,
বেলা হ'ল চল, চল গোঠে যাই।"

নন্দলালের সেই মধুর গীতধ্বনিতে আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল ; চাহিয়া দেখি আমার শয্যাপার্শ্বে নন্দলাল ও ললিতমোহন। ললিতমোহন বলিলেন, "এই বুঝি দাদার ভোরে নিদ্রাভঙ্গ ! উঠুন, উঠুন, মহারাজ প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে চ'লে গেছেন।" আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম, "তোমার মহারাজ ত আর রাত্তিরে ঘুমান না?" ললিত বলিলেন, "তিনি কি তবে সারারাত্রি জেগে থাকেন?" আমি বলিলাম, "সারারাত্তির জাগে দুই-জন—এক চোর, আর সাধক। মহারাজ তোমাদের একাধারে দুই-ই। আমি সাধক ত নই-ই, তোমার মহারাজের মত চোরও নই।" নন্দলালের গান আট্‌কায় না ; তিনি অমনি গান ধরিলেন—

দশম দিন

"আয় দেখি মন চুরী করি,
ওরে, তোমায় আমায় একত্র রে ;
শিবের সর্ব্বস্বধন শ্যামা-চরণ
যদি আন্‌তে পারি হরে' ।"

ললিত বলিলেন, "এখন উঠুন, পাকা সাতটী মাইল যেতে হবে !" আমি বলিলাম "প্রাতঃকৃত্য !" উত্তর হইল "প্রাতঃকৃত্য, তৈজসপত্র, খুঙ্গীপুঁথি, সব সেখানে হবে ।" এই বলিয়া ললিতমোহন আল্‌নার উপর হইতে একখানি কাপড় একখানি তোয়ালেতে জড়াইয়া লইলেন ; আমি হাতেমুখে একটু জল দিবারও অবকাশ পাইলাম না ; একখানি মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। গেটের নিকটেই আমাদের মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা চাপিয়া বসিলাম। মোটর বিকট শব্দ করিয়া কৈলাস-উদ্দেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

আমরা যে কৈলাস-দর্শনে যাইতেছি, তাহা আগরা হইতে সাত মাইল দূরে যমুনাতীরে অবস্থিত। 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' মহামতি সম্রাট্ আকবর শাহের নশ্বরদেহ যেখানে সমাধি-শয্যায় রহিয়াছে, সেই সেকেন্দ্রার সম্মুখ দিয়া যে রাজপথ চলিয়া গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া কিছুদূর গমন করিলেই দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটী প্রশস্ত পথ পাওয়া যায় ; সেইটি কৈলাসের পথ। সেই পথে কিছুদূর গেলেই যমুনাতীরে কৈলাসে উপস্থিত হওয়া যায়।

এই স্থানের নাম কৈলাস কেন হইল, কে এ স্থানে প্রথম আশ্রম

প্রতিষ্ঠা করেন, এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এবং এখানকার জনশূন্য শৈলমালা সাধনার উৎকৃষ্ট স্থান মনে করিয়া কে এখানে সর্ব্বাগ্রে আগমন করিয়াছিলেন, এখানে যমুনাতীরে যে একটী ধরমশালা আছে, তাহাই বা কে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এ সকল তথ্য-সংগ্রহের কোন চেষ্টাই আমি করি নাই, চেষ্টা করিবার কোন প্রয়োজনও অনুভব করি নাই ; কারণ আমি ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে বসি নাই ; আমি ত পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য সেখানে যাই নাই। আমি দেখিতে গিয়াছিলাম যে, যে স্থানকে কৈলাস নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা আমার কল্পনার কৈলাসের সহিত মিলে কি না ? দেবাদিদেব মহেশ্বরের কৈলাসের অনেক বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, অনেক দৃশ্য আবার মনে-মনেও গড়িয়া লইয়াছিলাম ; এই কৈলাসে তাহার কিছু আছে কি না, তাহাই দেখিবার ইচ্ছা আমার প্রবল হইয়াছিল। আরও এক কথা। যে আদি কৈলাস আমি দেখিতে যাইতে পারি নাই, এ জীবনে আর পারিব না ; সেই কৈলাসের নামগ্রহণ করিয়া যে স্থান আগরার অদূরে অবস্থিত, তাহা দর্শন করিলেও যদি ক্ষণেকের জন্য আমার বাসনা কিঞ্চিৎ চরিতার্থ হয়, তাহা হইলেও আমার যাত্রা বিফল হইবে না !

আমাদের মোটর যখন কৈলাসের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তখন দেখিতে পাইলাম আমরা লোকালয় হইতে দূরে আসিয়াছি। সম্মুখে কতকগুলি ছোট-ছোট প্রস্তর-মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাইলাম।

এগুলিকে মৃত্তিকাস্তূপ না বলিয়া শৈলমালা বলিলেই ঠিক কথা বলা হয়। দেখিতে-দেখিতে আমাদের মোটর এই শৈলশ্রেণীর নিকটস্থ হইল। সঙ্গীরা বলিলেন, মোটর আর অগ্রসর হইতে পারিবে না; আমাদিগকে এই স্থান হইতে পদব্রজে মহারাজাধিরাজের আশ্রমে উপস্থিত হইতে হইবে। মোটর ত্যাগ করিয়া, তখন আমরা পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া যে অপ্রশস্ত নূতন পথ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই আঁকাবাঁকা পথে চলিতে লাগিলাম; কিঞ্চিৎ চড়াই উৎরাইও ভাঙ্গিতে হইল। তাহার পরেই দেখিলাম, অদূরে একটী টিলার উপরিভাগে মন্দিরের মত একটা প্রস্তরনির্ম্মিত অতিক্ষুদ্র গোলাকার গৃহ; তাহার ছাদের উপরে চারিপার্শ্বে কয়েকটী ক্ষুদ্র স্তম্ভ; তাহার উপরে একটা প্রস্তরের আচ্ছাদন। সেই আচ্ছাদনের নিম্নে ঠিক ছাদের মধ্যভাগে একখানি প্রস্তরের আসনের উপর গরদের বস্ত্র পরিধান করিয়া মহারাজ বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে একজন গৈরিক-পরিহিত বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উপবিষ্ট এবং পার্শ্বে রাখাল দাদা রহিয়াছেন। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-সোপান অতিক্রম করিয়া সেই মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলে মহারাজ আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি উপরে উঠিয়া তাঁহার পার্শ্বেই বসিলাম। তিনি সন্ন্যাসীর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমি প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর মহারাজ সন্ন্যাসীর সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন।

আমি আর সেখানে বসিয়া কি করিব ? ধর্ম্মালাপ শুনিবার জন্য ত আমি সেখানে যাই নাই। আমাকে সেই স্থানের পবিত্র শান্ত দৃশ্যই অধিক আকর্ষণ করিতে লাগিল।

কি সুন্দর, কি মনোরম, কি পবিত্র সেই স্থান! সেই মন্দিরের পার্শ্ব দিয়াই যমুনা প্রবাহিত হইয়াছেন। যমুনার জল ধীরে-ধীরে চলিয়া যাইতেছে; অপরপারে দূরবিস্তৃত বালুকাময় তীরভূমি; তাহার প্রান্তে অরণ্যের শ্যামশোভা। কবি নহি, চিত্রকর নহি, ভাবুকও নহি। হায়! দেখিবার মত চক্ষুও নাই;—কলনাদিনী যমুনার আহ্বানবাণী শুনিবার মত কর্ণও নাই। আমি সে স্থানের কি বর্ণনা দিব ?

তবুও দেখিয়াছিলাম—নয়ন-মন এক করিয়া সেই পবিত্র আশ্রমভূমির, সেই দূরবিস্তৃত শৈলমালার, সেই কলনাদিনী যমুনার স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম! যমুনা দর্শন করিয়া সুধুই মনে হইতেছিল—

"যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী।
ও যার, বিমল তটে, রূপের হাটে
বিকাত নীলকান্তমণি।"

এতদিনে বুঝিতে পারিলাম, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ভারতবর্ষে এত স্থান থাকিতে এই আগরা সহরে বাস করিতে এত ভালবাসেন কেন ? একটু অবকাশ পাইলেই

দৌড়াইয়া আগরায় আসেন কেন? এখানে, এই কৈলাসে তিনি আনন্দলাভ করিয়া থাকেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। এখানে আসিয়া তিনি নিশ্চয়ই শান্তি পান; তাই কর্ম্মকোলাহল দূরে পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন শৈলশৃঙ্গে ছুটিয়া আসেন।

আমি যখন মহারাজের পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া নীচে নামিলাম, তখন তিনি আমাকে মন্দিরের মধ্যে যাইতে বলিলেন। আমি অতি সঙ্কুচিতভাবে মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলাম। দ্বারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করি কি না; যে মন্দির নির্ম্মাতার সাধনার স্থান, আমি সেখানে প্রবেশ করিয়া তাহার পবিত্রতা নষ্ট করিব কি না। আমার সেখানে, সে দেব-মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আছে কি? মহারাজ যেন মন্দিরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন; কিন্তু মহারাজের যিনি মহারাজ, তিনি যদি আমাকে ফিরাইয়া দেন;—তিনি যদি বলেন "দেবদর্শনের জন্য কি অর্ঘ্য লইয়া আসিয়াছ, দেখাও?" তাহা হইলে আমি কি দেখাইব?

এই মনে করিয়াই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম। মহারাজ তখন উপর হইতে বলিলেন, "ভিতরে গিয়ে দেখুন না।" তখন আর তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না; মনে করিলাম রাজরাজেশ্বরের আদেশ না পাইলেও তাঁহার প্রতিনিধির আদেশ ত পাইলাম। তখন মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

মন্দিরমধ্যে কোন দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম না;

পূজারও কোন উপকরণ দেখিলাম না। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য কিছুই নাই; পুষ্পাধারও নাই, সিংহাসনও নাই, পূজামঞ্চও নাই। মন্দিরে দেবতার মৃৎ বা প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি না থাকিবার এক কারণ তখন ভাবিয়া পাইয়াছিলাম, আর এক কারণ এখন পাইয়াছি। তখন আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, পাপমলিন হৃদয়ে তখনও বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম যে, এ নির্জ্জন দেবমন্দিরে কোন মূর্ত্তির প্রয়োজনাভাব। যাঁহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এখানে অমূর্ত্ত অবস্থায় সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছেন; প্রত্যেক শিলাখণ্ডে সেই অরূপীর নয়ন-মন-বিমোহন রূপ প্রতিফলিত রহিয়াছে। 'প্রতীকের' যে এখানে প্রয়োজনাভাব! এখানে তিনি স্বপ্রকাশ! আমি দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ছিল, তাই সেই দেবাদিদেবের সত্তা অনুভব করিতে পারিলাম। কৈলাস-দর্শনে আসিয়া ইহাই আমার পরম লাভ। যেখানে আসিলে মহারাজাধিরাজের ছত্রদণ্ড ধূলায় লুণ্ঠিত হয়, সেখানে আমাদের শূন্যগর্ভ গর্ব্ব-পরিপূর্ণ মস্তক অবনত হইবে না কেন? তখন বুঝিলাম, কাঙ্গাল হরিনাথ কেন কাঁদিয়াছিলেন—

"যদি ডাকের মত পারিতাম ডাক্‌তে।
তবে কি মা, এমন ক'রে
তুমি লুকিয়ে থাক্‌তে পারতে।"

যিনি ডাকার মত ডাকিতে পারেন, তাঁহার কাছে কি তিনি ধরা না দিয়া পারেন? তাঁহার হৃদয়মন্দিরে সেই চিন্ময় দেবতার প্রকাশ না হইয়া কি পারে? আমি এই কৈলাসে আসিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। সত্যসত্যই কৈলাসের সেই দেবমন্দির অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ; অনির্ব্বচনীয় পবিত্রতা তাহার প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে মিশিয়া রহিয়াছে।

অনুভূতির কথা বলিলাম, এখন যাহা চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছি, তাহার কথাও একটু বলি। সেই দেবমন্দির একেবারেই সজ্জিত নহে; বাহ্যিক সজ্জার কোন প্রয়োজন নাই, বুঝিতে পারিয়াই বিজয়ানন্দজি এ মন্দির সুধু আনন্দ দিয়াই ভরিয়া রাখিয়াছেন। সেই আনন্দের হিল্লোলেই এই মন্দির পুলকিত। অনেক দিন পূর্ব্বে এক রাতভিখারীর মুখে একটা গান শুনিয়াছিলাম। সে গানের গোড়াটা মনে নাই, কিন্তু একটা অন্তরা আমার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। এই আনন্দনিকেতন, এই বিজয়ানন্দ-নিকেতন, এই বিজয়ানন্দাশ্রম দর্শনে বারবারই সেই গানটা আমার মনে পড়িয়াছিল—

"সেথা আনন্দ-শাখীতে পাখী আনন্দ-সঙ্গীত গায়,
আনন্দময় ফুল ফল তায় বহিছে আনন্দ-বায়;
নিত্যানন্দধাম সে যে, কিছু নাই আনন্দ বই,
পিতা সদানন্দ আমার, মাতা যে আনন্দময়ী;

যদি কারু লাগে ক্ষুধা,

খেতে দেন আনন্দসুধা ;

তাইতে দ্বিজ গোবিন্দের আজ এত আনন্দ মরণে।"

দ্বিজ গোবিন্দ সত্যসত্যই বলিয়াছেন, এমন আনন্দের হাটে মরণে বড়ই আনন্দ! এই আনন্দনিকেতন দর্শনেও আমার সেই কথাই মনে হইয়াছিল ; মনে হইয়াছিল, হায় কি পুণ্য করিলে এই বিজয়ানন্দ-আশ্রমে আনন্দ-সঙ্গীত-শুনিতে-শুনিতে, আনন্দময়ের নাম করিতে-করিতে আনন্দধামে চলিয়া যাওয়া যায়। কি পুণ্যে —কি সাধনায়? ও গো বলিয়া দাও, কি মূল্যে এই সাধের মরণ ক্রয় করা যায়? এখানে আসিলে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। বাঁচিয়া থাকিলে যে আমাদের অনেক জ্বালা,—আনন্দ উপ-ভোগের যে অনেক বিঘ্ন। তার চাইতে আনন্দসাগরে ডুবিয়া মরাই প্রার্থনীয়।

থাকুক সে কথা। মন্দিরের কথা বলি। মন্দিরে কোন সাজসজ্জা নাই, কোন দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহার এক কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। আর একটা কারণ পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যিনি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর অল্প কয়েক-দিন হইল একখানি ইংরাজী পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার নাম "Meditations।" সেই পুস্তকের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"The scene changes—I am in a Shi-

valaya. Strings of temples of white marble, but not a soul in it! I shudder. I am lost in reverie. I think, I pray again, and the answer is 'Get ready to have a fight with sorrow and grief—with struggle and strife—these are only foreshadows. Do you not see why I showed you these Temples, but no devotees? Because, that is how they worship me. They only pray to these symbols, not to me—hence their prayers are soulless, temples lifeless.' I see the sign and bow." মহারাজাধিরাজের এই কথাতেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের কথা বুঝিতে পারিয়াছি।

মন্দিরে সাজসজ্জা নাই, দেবমূর্ত্তি নাই। তবে আছে কি? যাহা আছে, তাহা পূর্ব্বে একটু বলিয়াছি। এখন যাহা চক্ষে দেখিলাম, তাহাই বলি। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দেখি দুই পার্শ্বে দুইটি দ্বার। সেই দ্বারের সম্মুখেই দুইটা সোপানশ্রেণী ভূগর্ভে নামিয়া গিয়াছে। সেই সোপানাবলি দিয়া নামিয়া ভূগর্ভে দুইটী গুহা। গুহার মধ্যে কেবল একখানি করিয়া সামান্য আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। আর কিছু নাই—আর কিছু চর্ম্মচক্ষে দেখিবার নাই। আমি আর কিছু দেখিতে পাই নাই। যিনি এই গুহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি এই গুহায় সময় অতিবাহিত করেন, তিনিই

বলিতে পারেন, এই ভূগর্ভে অন্ধকারময় অপ্রশস্ত গুহায় আর কি আছে? কি আছে, যাহার জন্য ধনজন-ঐশ্বর্য্যবেষ্টিত মহারাজ এই অন্ধকার গহ্বরে দিনাতিপাত করেন।

গুহা দর্শন হইল,—দেবদর্শন হইল না। এমন সময় দ্বারের নিকট হইতে শব্দ আসিল "আসুন"। আমি কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম মহারাজাধিরাজ আহ্বান করিতেছেন;—কিন্তু চাহিয়া দেখিলাম—বিজয়ানন্দ! আমার এই দেবমন্দির এবং এই কৈলাস-দর্শন এই স্থানেই শেষ হইল। যাহা অনীর্ব্বচনীয়, তাহা বলিবার চেষ্টা করিয়া কি করিব?

মন্দির হইতে বাহিরে আসিলাম। তখন সকলে মিলিয়া আর একটি আশ্রম, আর একটি মন্দির দেখিতে গেলাম। মহারাজের এই মন্দির যে শৈলশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, অপর মন্দির বা আশ্রম তাহা হইতে কিছু দূরে আর একটি শৈলশৃঙ্গে নির্ম্মিত হইয়াছে,—মহারাজই নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্যই এই আশ্রমটি নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু তিনি এখন এই আশ্রমচ্যুত। পূর্ব্বে যে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছি, এখানে এখন তিনিই সশিষ্য বাস করেন। আমরা খানিকটা পথ ঘুরিয়া এই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম কয়েকটী সন্ন্যাসী এই আশ্রমে রহিয়াছেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি একটু পিছনে পড়িয়াছিলাম। আমি যখন সেই আশ্রমদ্বারে

উপস্থিত হইলাম, তখন আমার আর প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল না। দ্বারের নিকট হইতেই চাহিয়া দেখিলাম, প্রকোষ্ঠের মধ্যে কতকগুলি হাঁড়ি সাজান রহিয়াছে। আরে, হাঁড়ি!—তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ কর নাই। কৈলাসে আসিলাম—তবু হাঁড়ি সঙ্গেই আসিয়াছে। এই হাঁড়ি যে লোকালয়ে ফেলিয়া আসিয়াছি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। হাঁড়ির চিন্তাতেই ত এত-দিন কাটিয়া গিয়াছে। সামান্য এক দণ্ডের জন্য যে হাঁড়ির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেই হাঁড়ি আগের খেয়ায় পার হইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে! হায়! হাঁড়ি, তুমি আমার সঙ্গ কি ত্যাগ করিবে না? তাই এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের স্কন্ধে ভর করিয়া তাঁহাদের সাধনাশ্রম দখল করিয়া বসিয়া আছ? বুঝিলাম গৃহী হইলেও হয় না, সন্ন্যাসী হইলেও হয় না;—হাঁড়ি সহজে সঙ্গ ছাড়ে না। তখন কাঙ্গাল হরিনাথের সেই গানটি আমার মনে পড়িল—

বৈরী জটিলা কুটিলা আমার বাসনা।
আমি মনেতে করি, গৃহ সাধন-অরি,
বনে যাব, নাম করিব দিবা-সর্ব্বরী;
কিন্তু, বাসনা থাকিলে মনে বনে গেলেও যন্ত্রণা।"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না; বিষণ্ণ মনে সে স্থান ত্যাগ করিলাম; পঙ্কমলিন হৃদয়কে যদি বা একটু

খিতাইয়া লইয়াছিলাম, এই দৃশ্য দেখিয়া আবার তাহা পঙ্কিল হইয়া গেল ; ক্ষুদ্র হৃদয় আবার ক্ষুদ্রতায় পরিপূর্ণ হইল। আমার এই ভাবপরিবর্ত্তন মহারাজের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। তিনি আমাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এমন চুপ করে গেলেন কেন ?" আমি বলিলাম "এ আশ্রমটী আমার ভাল লাগিল না।" তিনি আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন ; তাই বলিলেন, "আমিও তা বুঝতে পেরেছি ; অনেকগুলো নানাভাবের লোক এসে স্থানটাকে গোল করে দিতে বসেছে।"

তাহার পরই মহারাজ স্নান করিতে গেলেন ; আমরাও, যেখানে আমাদের আহারের আয়োজন হইতেছিল, সেইস্থানে গেলাম। মহারাজ পূর্ব্ব রাত্রিতে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, কৈলাসে সকলে মিলিয়া চড়ুইভাতি করা হইবে। আমি মনে করিয়াছিলাম, মহারাজ রন্ধন করিবেন, আমরা জল টানিব, কাঠ কুড়াইব, বাঁটনা বাঁটিব, তরকারী কুটিব,—বেশ চড়ুইভাতি হইবে। কিন্তু মহারাজ এ আনন্দ সম্ভোগ করিতে দিলেন না, রাজহস্তের রাঁধা খিচুড়িভোগ পাইবার সৌভাগ্য হইল না। দেখিলাম, একদল ভৃত্য, রাঁধুনী ও কর্ম্মচারী আসিয়া রাজ-ভোগের আয়োজন করিয়া বসিয়াছে। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। আমি গরিব মানুষ, গরিবের মত চড়ুইভাতি হইবে বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু এ চড়ুইভাতির উদ্যোক্তা যে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ,—কৈলাসের বিজয়ানন্দ নহেন !

তখন বুঝিলাম, এই যমুনাতীরে মহারাজ আমাদের জন্য রাজোচিত চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমরা তখন সকলে মিলিয়া যমুনায় অবগাহন করিলাম। তাহার পর মহারাজকে লইয়া ভোজন। মহারাজের ব্যবস্থিত চড়ুইভাতির একটা বর্ণনা দিব কি? আমরা ছেলেবেলায় চড়ুইভাতি করিতাম। সে এক ব্যাপার! হৈ হৈ কাণ্ড! সকলের প্রাণান্ত পরিশ্রমে অপরাহ্ন তৃতীয় প্রহর গতে আমরা চড়ুইভাতির খিচুড়ি আহার করিতাম; হয় ত খিচুড়ির ডাইল গলিয়া একেবারে অস্তিত্বশূন্য হইয়াছে, এদিকে চাউলগুলি মোটেই সিদ্ধ হয় নাই; আলুভাজা হয় ত কাঁচা আছে, বেগুনপোড়া হয় ত দগ্ধ অঙ্গারবর্ণ হইয়াছে; শাকের ঘণ্ট হয় ত লবণে পুড়িয়া গিয়াছে। আর আমরা সেই সকলই পরম উপাদেয় জ্ঞান করিয়া পরমানন্দে আহার করিয়াছি; একটুও ক্লেশবোধ হয় নাই, অজীর্ণও হয় নাই। আর মহারাজের এই চড়ুইভাতিতে সে সব কিছুই নাই। উৎকৃষ্ট পুরী, নানা-উপাদেয় মস্‌লা-সমন্বিত পোলাও, বহুবিধ নিরামিষ তরকারী, (আমিষের সম্বন্ধও সে দিন ছিল না) তাহার পর দধি ক্ষীর পায়সান্ন, নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফলমূল। ইহার নাম রাজভোগ—চড়ুইভাতি নহে। সে যাহাই হউক, তাহাতে প্রকৃত ব্যাপারের কিছুই বিঘ্ন হইল না। এই বিপুল আয়োজনের যথারীতি সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা জয়ধ্বনিপূর্ব্বক কৈলাস ত্যাগ করিলাম এবং অপরাহ্নকালে

বাসায় আসিয়া এই গুরুতম চড়ুইভাতির জের মিটাইতে আমাদের সন্ধ্যা হইয়া গেল। তথন যাত্রার আয়োজন করিতে হইল। রাত্রি দশটার সময় তিন দিনের প্রবাসস্থান আগরা ত্যাগ করিয়া আমরা রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম এবং আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে উঠিয়া শয়নের আয়োজন করিলাম। শুক্রবার কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলাম, মঙ্গলবার আগরা ত্যাগ করিলাম। আমার **দশদিনের** এক অঙ্কের অভিনয় শেষ হইয়া গেল।

কাশীর পথে

ইংরাজী মাসের বুধবার, যথন পড়িল, তথন আমরা তুণ্ডুলা ষ্টেশনে। বর্দ্ধমানাধিপতি মহোদয় তাঁহার গাড়ীতে নিদ্রিত, আর আমরা সে রাত্রি নিদ্রা যাইব না বলিয়া একেবারে কৃতসঙ্কল্প! কথন শয়ন করিয়া, কথন বসিয়া, কথন বা ষ্টেশনের প্ল্যাট্ফরমে পাইচারি করিয়া, এবং কথাটা গোপন করিবারও বিশেষ প্রয়োজন দেখি না, পাঁচ ছয়বার চায়ের শ্রাদ্ধ করিয়া আমরা কয়েকটী জীব রাত্রি-জাগরণ করিলাম।

আমরা যে গাড়ীতে উঠিব, তিনি শেষরাত্রিতে তুণ্ডুলা ষ্টেশনে আগমন করেন; কিন্তু রেল কোম্পানী এমনই তৎপর যে, তাঁহারা রাত্রি দশটার পরেই আমাদিগকে সেই গাড়ীতে

তুলিয়া দিবার জন্য আগরা হইতে তণ্ডুলায় আনিয়া বসাইয়া রাখিলেন; ঐ সময়ের পর সারারাত্রির মধ্যে আগরা হইতে আসিবার আর গাড়ী নাই। ব্যবস্থা যে অতি সুন্দর, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অনুচরবর্গ সর্ব্বদা রেলে বেড়াইয়া একেবারে আটঘাট চিনিয়া লইয়াছেন; কোথায় কি করিতে হইবে, সব তাঁহারা জানেন। ডাক্তার বাবু ও সেক্রেটারী মহাশয় স্বাস্থ্যতত্ত্বের আদেশ সম্পূর্ণ অমান্য করিয়া সেই রাত্রি তিনটার সময় ষ্টেশনের স্নানাগারে প্রাতঃস্নান শেষ করিয়া লইলেন। চিত্রকর শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ হিন্দুস্থানী যুবক; স্নানাহারের অভাব তেমন গ্রাহ্যই করেন না; তিনি মহাজনগণের পন্থা অনুসরণ করিলেন না। আর আমি হিন্দুসন্তান;—কাশী যাইবার পথের মধ্যে রেলের স্নানাগারে স্নান করিয়া কি পরকালের পথরোধ করিব? তবে রাত্রিতে অর্থাৎ রাত্রি বারটার পর যে ক্রমাগত চা পান করিয়াছি, তাহাতে কোন দোষ হয় নাই এবং তাহাতে উপবাসও ভঙ্গ হয় নাই; কারণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ত আমাদের মতে পরদিন হয় না। ইংরাজের সবই তাড়াতাড়ি; তাই তাঁহারা রাত্রি বারটার পরই পরের দিন সুরু করিয়া দেন। আমরা ইংরাজের আইন সব স্থানে মানিয়া চলি; কিন্তু সুনিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া রাত্রি বারটার পর দিন বদলাই না; সুতরাং বুধবারের স্নানটা মঙ্গলবার রাত্রিতে করিয়া রাখা আমার পোষাইল

না। গমনসময়ে আমাদের আর একজন সঙ্গী ছিলেন শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায় দাদা মহাশয়। তিনি ফিরিবার সময় আমাদের সঙ্গী হইলেন না; তিনি না কি ধীরেসুস্থে মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তবে দেশে ফিরিবেন।

আমার দশদিনের ছুটী। তাহার পাঁচদিন পথে ও আগরায় কাটিয়া গেল; অবশিষ্ট পাঁচ দিন কাশীতে কাটাইবার ব্যবস্থা ছিল। বর্দ্ধমানের সবজজ্ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু দাদা মহাশয় তখন কাশীতে সপরিবারে পূজার ছুটী কাটাইতেছিলেন। অন্য সময়ে, সেই সেকালে যখন কাশীতে যাইতাম, তখন আশ্রয়-স্থান পূর্ব্বে স্থির করিতাম না; তখন যে আমার পূর্ব্বও ছিল না, পরও ছিল না,—ছিল একমাত্র বর্ত্তমান। তখন আমি কাশীতে পৌঁছিয়া একেবারে কাশীশ্বর দেবাদিদেব বিশ্বনাথের শরণ লইতাম;—তখন বিশ্বনাথের আতিথ্যই গ্রহণ করিতাম; তিনিই আহার দিতেন, আশ্রয় দিতেন,—আমাকে কিছু ভাবিতে হইত না। এখন যতই বেলা পড়িতেছে, ততই 'আমি'টা মাথা তুলিতেছে; এখন বিশ্বনাথের আশ্রয় গ্রহণ করা আর হয় না,—এখন নরনাথ খুঁজি। হায় অধঃপতন!

সে কথা থাকুক। আগরায় পৌঁছিবার পরের দিনই শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আদেশ করিলেন যে, আমি সেইদিনই কাশীতে দেবেন্দ্র দাদাকে যেন সংবাদ পাঠাই যে, আমি বুধবারে কাশীতে যাইব; তিনি যেন আমাকে লইয়া যাইবার জন্য মোগল-

সরাই ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়া দেন। যাহাতে 'তার'-যোগে তাঁহার উত্তর পাওয়া যায়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। যথাসময়ে 'তারে'ই উত্তর আসিল—'হাঁ তাহাই হইবে'। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাহাতেই নিশ্চিন্ত হইলেন না; তিনি বলিলেন "মোগলসরাই ষ্টেশনে যদি লোক না আসে, তাহা হইলে আপনাকে একেলা নামিতে দিব না, আপনাকে কলিকাতায় চলিয়া যাইতে হইবে।" হায় মহারাজ, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আপনি কোথায় ছিলেন? তখন যে আমার এক বিশ্বনাথ ছাড়া কেহই ছিলেন না; তখন আমার মুখের দিকে চাহিবার লোক ত ছিল না; তখন ত একেলাই কত দেশ-বিদেশ, কত পাহাড়-পর্ব্বত ঘুরিয়াছি। আর এখন বর্দ্ধমানাধিপতি আমাকে একেলা কাশী যাইতেও দিতে চাহেন না। বৃদ্ধ বয়সে আমি নাবালক হইয়া পড়িয়াছি। সে কথাও বলি; এখন ত আর সে নির্ভরের ভাব নাই; এখন যে লোটাকম্বল খসিয়া পড়িয়াছে; এখন যে প্রাতঃকালে উঠিয়া চা-পান করিতে হয়; এখন যে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে আহার না করিলে পেট জ্বলিয়া যায়; এখন যে একটু অনিয়ম হইলে মাথা ধরে, জ্বর হয়; এখন যে গুরুভোজন সয় না। হা অদৃষ্ট, ভিক্ষালব্ধ পাহাড়ী রুটিতে যাহার দিন কাটিয়াছে; আধসের তিনপোয়া মোটা চাউল যে সিদ্ধ না করিয়া চর্ব্বণেই উদরস্থ করিয়া এক গণ্ডুষ জলপান করিয়া মহাতৃপ্তি অনুভব করিয়াছে; দুইতিনদিনের অনাহারে

যাহাকে ক্লান্ত করিতে পারে নাই; দুরারোহ পর্ব্বতের দশ-বারো মাইল চড়াই যে হাসিতে-হাসিতে অতিক্রম করিয়াছে;—
—সে আর এখন নাই! তাই মহারাজাধিরাজের এত সাবধানতা। সে শক্তি-সামর্থ্য নাই; সে সংযম নাই; সে নির্ভরশীলতা নাই; সে উৎসাহ নাই;—সে সকল কিছুই নাই। তাই মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁহার এই সঙ্গীটীর পরিচর্য্যার জন্য একদল ভৃত্য নিযুক্ত করেন; ঘণ্টায় পাঁচবার খোঁজ নেন—আমি কেমন আছি; তাই আজ তিনি এই দুর্ব্বল বৃদ্ধ শিশুটীকে বিনা সঙ্গীতে কাশী যাইতে দিতে চান না। তিনি বুঝিয়াছেন, বৃদ্ধের এখন অবলম্বন-যষ্টি চাই। তাহাই হউক!

অপরাহ্নকালে আমাদের গাড়ী মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌছিল। মহারাজাধিরাজের অনুগ্রহে আগরায় আমার লগেজ যথেষ্ট বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল। এত সব লইয়া কাশীগমন হইতে পারে না—পাপের বোঝাই যে প্রকাণ্ড! বন্ধুগণ আমার বোঝা বহিতে স্বীকৃত হইলেন; তাঁহারা আমার লগেজগুলি কলিকাতায় আমার বাসায় পৌছাইয়া দিবেন বলিলেন। বিছানা ও ব্যাগটীও তাঁহাদের সঙ্গে দিতে চাহিলাম; কিন্তু তাঁহারা সে দুইটি দ্রব্য লইয়া যাইতে চাহিলেন না; সুতরাং তাহাদেরও কাশীদর্শনই স্থির হইল।

মোগলসরাই ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিলে দেখা গেল যে, পূজনীয় দেবেন্দ্র দাদা একটী লোক পাঠান নাই—এক রেজিমেণ্ট পাঠাইয়া-

ছেন। ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র আমাকে কাশী লইয়া যাইবার জন্য এত লোক! আমি একেবারে এতটুকু হইয়া গেলাম। দেবেন্দ্র দাদার পাঁচটী পুত্র; সে পাঁচজনই ষ্টেশনে আসিয়াছেন; তাঁহার শিশু পৌত্রটিকে যে ষ্টেশনে পাঠান নাই, ইহাই রক্ষা! তাহার পর ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন বর্দ্ধমানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ নবীন উকীল, আমার পরম স্নেহভাজন মন্মথকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল। কিন্তু হায়, মন্মথকুমার আর ইহজগতে নাই; কাশীতেই তাঁহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ! কাশী হইতে বর্দ্ধমানে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই তিনদিনের জ্বরে নবীন যৌবনে মন্মথকুমার সকল মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা, তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারের কথা মনে হইলে এখনও চক্ষে জল আসে। তাহার পর ষ্টেশনে দেখিলাম আমাদের সেই বর্দ্ধমান-সম্মিলনের স্বেচ্ছা-সেবকগণের অধিনায়ক, বর্দ্ধমান কলেজের অধ্যাপক, আমাদের মন্মথকুমারেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ গিরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল। এতদ্ব্যতীত আরও সাত-আটটি যুবক আমাকে কাশীতে লইয়া যাইবার জন্য মোগলসরাই ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি ত অবাক্। আমার জন্য এত আগ্রহ কেন? এ যে বিপুল অভ্যর্থনা! আমি ত ইহার যোগ্য নহি। নিজের অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া কুণ্ঠিত হইলাম; কিন্তু

দেবেন্দ্র দাদার অপার স্নেহের কথা, তাঁহার পুত্রগণের ও মন্মথ গিরীন্দ্রের শ্রদ্ধার কথা মনে করিয়া হৃদয়ে বল পাইলাম। মনে হইল, আমি এমন কি মানুষ যে, আমার উপর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের স্নেহ-অনুগ্রহ অবিরাম বর্ষিত হইতেছে; দেবেন্দ্র দাদার স্নেহ আমাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য সদা অগ্রসর; আর এই যুবকবৃন্দ আমাকে এই শ্রদ্ধাভক্তি করেন। এত স্নেহ, এত অনুগ্রহ লাভ করিবার উপযুক্ত হওয়া যায় কেমন করিয়া। এই বৃদ্ধ বয়সে এক-একবার মনে হইল, উপযুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিলে হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রাণে নববলের সঞ্চার হয়, নিজেকে যোগ্য করিবার বাসনা প্রবল হয়।

সে কথা এখন থাকুক। এই রেজিমেণ্টের কেহ আমার বিছানা অধিকার করিলেন, কেহ ব্যাগটা নামাইয়া লইলেন। তাহার পর সকলে মিলিয়া মহারাজাধিরাজের নিকট উপস্থিত হইলাম। মহারাজও এই রেজিমেণ্ট দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহার পর আমাকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন "তোমরা না আসিলে আমি ওঁকে একেলা যাইতে দিতাম না।" আমাকে বলিলেন, দেবেন্দ্র দাদাকে পাইয়া যেন ঘরের কথা ভুলিয়া না যাই। আমি অবনতমস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। কোথাকার কে আমি! এই নগণ্য ব্যক্তির জন্য মহারাজাধিরাজের হৃদয়ে এত অনুগ্রহ, এত স্নেহ!

দশমদিন

মহারাজাধিরাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমি আমার পাঁচদিনের দিনরাতের সঙ্গীদিগের গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা সকলেই গাড়ীর সম্মুখে প্ল্যাট্‌ফরমে দাঁড়াইয়া ছিলেন। নন্দলাল, ললিত, রামেশ্বরপ্রসাদের নিকট বিদায়-গ্রহণ করিলাম। তাঁহারা বড়ই বিমর্ষ; বিদায় যেন তাঁহারা দিতে চান না। কিন্তু তাহা কি এ জগতে হয় ভাই! কে কাহাকে কবে স্নেহের বন্ধনে, বাহুপাশে আবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছে? যেতে দিতেই হয়! কত স্নেহের ধন, আনন্দদুলালদুলালীকে হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করিয়া, হাহাকারে দিঙ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া চিরদিনের জন্য যাইতে হইয়াছে! এ ত পাঁচদিনের জন্য বিদায়! অত কথা বলিবার তখন সময় ছিল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল; বন্ধুগণ গাড়ীর জানালার মধ্য দিয়া মুখ বাড়াইয়া বিদায়-অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। মহারাজাধিরাজের গাড়ীখানি যখন আমাদের সম্মুখ দিয়া গেল, তখন তিনিও হাত নাড়িয়া আমাদের সম্ভাষণ করিলেন। পঞ্জাবমেল কলিকাতার দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। আমরা ষ্টেশনের অপরপার্শ্বে দণ্ডায়মান কাশী-গমনোন্মুখ গাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম। সঙ্গীদিগের হাস্য-তরঙ্গে, আমোদ-আনন্দে গাড়ীখানি মুখর হইয়া উঠিল। একটু পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমরা কাশীযাত্রা করিলাম।

কাশী

কাশীতে পৌঁছিয়া সকলে মিলিয়া 'টেরি নিম' নামক গলিতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু দাদামহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলাম —মনে হইল যেন বাড়ীতে গেলাম। দেবেন্দ্র দাদা আর অভ্যর্থনা করিবেন কি? তিনি আনন্দেই অধীর হইলেন। কত বৎসর আশা দিয়াছি যে, পূজার সময় তাঁহার কাশীর বাড়ী দেখিতে যাইব; কিন্তু একবারও কথা রক্ষা করিতে পারি নাই। এবার আমি কথা রক্ষা করিয়াছি, ইহাতেই দাদার আনন্দ!

দেবেন্দ্র দাদার বাড়ীতে দেখিলাম আনন্দের হাট বসিয়াছে। দিনরাত গানবাজনা চলিতেছে। কলিকাতা হইতে অনেক ভদ্রলোক এবার কাশীতে আসিয়াছেন; সকলেই দয়া করিয়া দেবেন্দ্র দাদার ভবনে পদধূলি দিয়া থাকেন। আর শুনিলাম, আমাদের বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দেখা করিবার জন্য কাহারও বাসায় যাইতে হয় না; সন্ধ্যার পূর্ব্বে দশাশ্বমেধ-ঘাটের রাস্তায় গেলে সকলের সঙ্গেই দেখা হইতে পারে। দেবেন্দ্র দাদা দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, পাঁচদিন আগে আসিলে আমি সাহিত্যিকগণের 'পূর্ণিমা সম্মিলনে' যোগদান করিতে পারিতাম। বড়দাদা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র (পূজনীয় নাট্যকার পরলোকগত দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ-পুত্র) বলিলেন যে, কাশীর সম্মিলনে

খুব আনন্দ হইয়াছিল। এ সম্মিলনের অনুষ্ঠাতা দেবেন্দ্র দাদা। বুঝিলাম, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তার সাক্ষী আমাদের এই দার্শনিকপ্রবর দেবেন্দ্র দাদা। ইনি চাকুরী করেন সব-জজিয়তী;—হাড়ভাঙ্গা খাটুনী; তাহার পরও সাহিত্যচর্চ্চা করেন। সে সাহিত্যও আমাদের মত চুট্‌কী ব্যাপার নহে; তিনি দার্শনিক;—একরাশ গ্রন্থ না পড়িলে একটা প্রবন্ধ হয় না। এত খাটুনীর পর পূজার সময় মাসাধিককালের অবকাশ পান। সেই সময় কাশীতে আসেন। কিন্তু এখানে আসিয়াও তাঁহার বিশ্রাম নাই—এখানেও সাহিত্য-সম্মিলন! কি ভয়ানক কথা! আসি নাই, ভালই করিয়াছি। দশদিনের জন্য জন্য একটু আরাম উপভোগ করিতে আসিয়াছি; এখানেও সাহিত্য আর সাহিত্যিক! এখানেও সেই—। না, কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের ধামে আসিয়া আর সে কথা না-ই তুলিলাম।

যাক্, হাতেমুখে জল দিয়া চা ও জলযোগ করিয়া তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম। আরে সর্ব্বনাশ,—পথে দেখি সবই আমরা; যে দিকে চাই, সেইদিকেই দেখি, আমাদের কলিকাতার দলের কেহ না কেহ উপস্থিত। একটা দোকানঘরের সম্মুখে একটা টানা বারান্দা। সেই বারান্দায় লম্বা কয়েকটি মাদুর পাতিয়া সভা করিয়া বসিয়াছেন আমাদের পূজনীয় বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়। তিনি একাই এক সহস্র। সেখানে খুব প্রকাণ্ড আসর জমিয়া গিয়াছে; আমাদের অনেকেই সেখানে উপস্থিত

আছেন। দেদার গল্প চলিতেছে। গল্পগুলি সেই মামুলী,—যাহা লইয়া আমরা দিনরাত ঘরকরণা করি। সেখানে উপস্থিত ভদ্রলোকগণের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটের দিকে চলিলাম। পথে আরও অনেকের সহিত দেখা হইল। দুই চারিটা নাম করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, কাশীতে আমাদের অনেকেই আসিয়াছেন। এই ধরুন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনিলাম আরও অনেকে আসিয়াছিলেন, চলিয়া গিয়াছেন। আমরা যে দিন আগরায় যাই, সেদিন মোগলসরাই ষ্টেশনে বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয় সদলবলে কাশী হইতে আসিয়া আরও পশ্চিমে যাইতেছিলেন। এমন কত নাম করিব ?

একটু বেড়াইয়া আসিয়া দেখি, দেবেন্দ্র দাদার বৈঠকখানায় গান আরম্ভ হইয়াছে। ভাল কথা! রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত গানই চলিল; তাহার পর আহার। এ ব্যাপারের যদি বর্ণনা দিতে যাই, তাহা হইলে দশদিনে কুলাইবে না ; ভবিষ্যতে দেবেন্দ্র দাদারও বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। সে চেষ্টা করিয়া কাজ নাই। আহারান্তে বিশ্রাম !

কাশীতে পূর্ব্বেও আসিয়াছি ; এবারও আসিলাম। কিন্তু

কাশীর বিবরণ, কাশীর মাহাত্ম্য কখনও বর্ণনা করি নাই। এবার এই 'দশদিন' লিখিতে বসিয়া সেই কথাই ভাবিতেছি। আমি যতদূর জানি, তাহাতে কাশীর কথা ইংরাজী, বাঙ্গালা অনেক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে,—গদ্যে পদ্যে লিখিত হইয়াছে। সেই সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলে কাশীর কথা সকলই জানিতে পারা যায়। তাহার পর এই রেলের সুবিধায় কাশী দর্শন করেন নাই, এমন হতভাগ্যের সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং কাশীর কথা আর আমি কি লিখিব? যাহা লিখিব, তাহাই ত পুরাতন কথা—তাহা ত সকলেই জানেন। বিশেষ আমার এই ক্ষুদ্র 'দশদিনে' কাশীর কথা বলিবই বা কি? আমি কোথায় গেলাম, কি দেখিলাম, কাহার সহিত কি কথা হইল; এ সমস্ত কথা লিখিয়া অবশ্য গ্রন্থের কলেবর স্ফীত করা যাইতে পারে, এবং আমি তাহা অনেক করিয়াছি; বর্ত্তমান 'দশদিনে'ও তাহার অভাব নাই। এ অবস্থায় আমার কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই ভাবিতেছি।

'অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির' যে, আমি বাবা বিশ্বনাথকে প্রণাম করিয়াই বিদায় গ্রহণ করিব; অন্নপূর্ণাকে যখন দেখিতেই পাই না, অন্নের অভাবে যখন দিবানিশি আর্ত্তনাদ করি, তখন তাঁহার মাহাত্ম্যের কথা আপাততঃ না বলিলেও বিশেষ প্রত্যবায় হইবে না। দুর্গাবাড়ীতে যথেষ্ট বানরের সমাগম হইয়া থাকে; সেখানকার দর্শকের সংখ্যা যে আর একটী বাড়িয়াছিল, সে সংবাদ

না দিলেও পাঠকপাঠিকাগণের সে কথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না; আর দশাশ্বমেধ-ঘাটের এত নিকটে যখন বাসা বাঁধিয়াছিলাম, এবং পদদ্বয় যখন এখনও তেমন অসাড় হয় নাই, তখন ঘরের মধ্যে কলের জল থাকিতেও যে প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়াছি, সে কথাটাও না বলিলে চলে। মনের ময়লা ধুইয়া যাউক আর না যাউক, শরীরের ময়লা এবং গুরুভোজনের অবসাদ যে গঙ্গাস্নানে দূর হইয়াছিল, এ কথা খুব বলিতে পারি। তাহার পর সস্তা ভাড়ায় একা পাইয়া যে সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইবার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং সে সস্তা ভাড়াটাও যখন দেবেন্দ্র দাদার সদামুক্ত তহবিল হইতেই প্রদত্ত হইত, তখন ত আমার চিন্তার কোন কারণই ছিল না। এ সকল কথা বিনাইয়া-বিনাইয়া দফাওয়ারী বলিবার কিছু প্রয়োজন আছে কি? যাঁহাদের সময়ের মূল্য আছে, তাঁহারা বলিবেন "না, ভাই, তোমার ও সকল কথা থাক; ততক্ষণ এস একটু পরচর্চ্চা করা যাউক।" আর যাঁহারা আট-আনায় থিয়েটারের টিকিট কিনিয়া সন্ধ্যা সাড়েসাতটা হইতে ভোর ছটা পর্য্যন্ত, এই গরমের দিনে বসিয়া অভিনয় দেখিয়া থাকেন; যাঁহারা ছয়টি পয়সা ট্রামভাড়া দিয়া, ঠনঠনের কালীতলায় নামিবার বরাত থাকিলেও পয়সা ছয়টা ওয়াসিল করিবার জন্য শ্যামবাজারের ট্রামের ডিপো পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলিবেন "বলুন না মশাই, পয়সা ক-আনা আদায় হইয়া যাউক; যতটুকু কাগজ পাওয়া যায়, তাহাই লাভ।" এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি? বাড়ীতে ভিখারী যখন

গান করিতে আসে, তখন কেহ 'সখীসংবাদ' ফরমাইস করেন, কেহ শ্যামাবিষয় গায়িতে বলেন ; ভিখারী উপায়ান্তর না দেখিয়া গান ধরে·—

"যত রকম ডা'ল আছে এ সংসারে,
কলাইয়ের কাছে সব বেটা হারে।"

আমাকেও তাহাই করিতে হইতেছে। আমি মামুলী কথাগুলি সাফ বাদ দিয়া অন্য কথা বলিব। আপনারা অবধান করুন। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি, কাশীতে এবার আমার ভ্রমণসঙ্গী দার্শনিকপ্রবর সুধী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু দাদা মহাশয় ; সুতরাং তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাহা-যাহা দেখাইয়াছিলেন, তাহারই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব ; কোনটী বা অতি সংক্ষেপে, কোনটী বা অতি বিস্তৃতভাবে।

একদিন দেবেন্দ্র দাদা বলিলেন "চল ভায়া, 'সারনাথ' দেখিয়া আসি।" আমি বলিলাম, তথাস্তু। সারনাথ কাশী হইতে একটু দূরে ; দেবেন্দ্র দাদা অসুস্থ ; সুতরাং সনাতন এক্কায় চড়াইয়া এত দূরপথে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া অকর্ত্তব্য বিবেচিত হওয়ায় গাড়ী-ভাড়া করা গেল। মধ্যাহ্নের আহার শেষ করিয়া আমরা সারনাথ যাত্রা করিলাম। আমরা চারিজন ; যথা—বড়দাদা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র দাদা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ এবং আমি। ঘণ্টাখানেক গাড়ীর ঝাঁকুনি সহ্য করিয়া প্রায় তিনটার সময় আমরা সারনাথে পৌছিলাম।

সারনাথ বা বৌদ্ধ-বারাণসী

এখন বিষম সমস্যা। সারনাথের কথা কেমন করিয়া আরম্ভ করি। এখন ইতিহাসের যুগ পড়িয়াছে; আবার সেও যে সে ইতিহাস নহে; মার্সম্যান, ট্যালবইস্ লুইলারের ইতিহাস এখন নামঞ্জুর হইয়া গিয়াছে; এমন কি ভিন্সেণ্ট স্মিথের মত প্রচণ্ড ঐতিহাসিকও স্থলবিশেষে কলমের খোঁচা খাইতেছেন। এখন বৈজ্ঞানিক-প্রণালী-সম্মত ইতিহাস না হইলে কেহ পড়েন না। আমি ঐতিহাসিক নহি, প্রত্নতাত্ত্বিক ত নহি—নহি; বিজ্ঞানের সঙ্গে ত আমার ভাসুর-ভাদ্রবধূ সম্বন্ধ। আমি সাহিত্যের বাজারে নগ্‌দা মুটে—দুইটা পয়সা পাই, আর মোট বহি। আমি ইতিহাসের কি জানি? অথচ সারনাথের ইতিহাস না বলিলে কিছুই বলা হয় না। তখন পাঁজিপুথি ঘাঁটিতে লাগিলাম। আরে সর্ব্বনাশ, এত পড়ে কে? তাহার পর এই সমস্ত পড়িয়া তাহার সারসংগ্রহ করা—সে এক বিষম ব্যাপার! তাহাতেই কি রক্ষা আছে? কোন স্থলে ৬৩ র স্থানে যদি অসাবধানতা বা অজ্ঞতাবশে বা শ্রীহস্তের লিপির দোষে ৬৬ হইয়া যায় এবং তাহাই ছাপা হইয়া যায়, তাহা হইলে দশ দিক হইতে দশ দিক্‌পাল একেবারে হাঁ, হাঁ করিয়া উঠিবেন এবং কর্ম্মকার হইয়া কুম্ভকারের কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছি বলিয়া, বর্ত্তমান শিষ্ট-সমালোচনার নিয়ম অনুসারে আমার সম্পূর্ণ নিরপরাধ ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধের

ব্যবস্থা করিবেন। অতএব আমি একটি নিরাপদ পন্থা অবলম্বন করিলাম। বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাস-পাঠকগণ শ্রীমান রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ ভায়ার নাম নিশ্চয়ই জানেন; এবং তিনি যে বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক, তাহাও সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই শ্রীমান রাখালদাস 'সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা'র দ্বাদশ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় 'বৌদ্ধ-বারাণসী' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমি তাঁহার অনুমতিক্রমে সেইটী এখানে উদ্ধৃত করিয়া ইতিহাস-পিপাসুগণের তৃষ্ণা-নিবৃত্তি করিতেছি। প্রবন্ধটীর একটু ছাটকাট করিয়া, একটু-আধটুকু ভাষা বদলাইয়া, অনায়াসে নিজস্ব—'ওরিজিনাল' করিয়া লইতে পারিতাম—অনেকে না কি তাহা করিয়া যশস্বীও হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীমান রাখাল একে ছোটভাই, তাহার উপর ইতিহাসের প্রত্যেক অক্ষরটী তাঁহার কণ্ঠস্থ। এ অবস্থায় এমন কর্ম্ম আর এ বৃদ্ধ বয়সে, ভয়েই হউক বা যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণাতেই হউক, করিয়া উঠিতে পারিলাম না। সারনাথের ঐতিহাসিক অংশ একটু দীর্ঘ হইবে; কিন্তু তাহা বলিয়া উপায় নাই; ব্যাপারটা ত ছোট নহে, সুদীর্ঘ—একটা ইতিহাসের মত ইতিহাস। অতএব আপনারা অবধান করুন। নীরস বলিয়া ফেলিয়া দিবেন না—বৌদ্ধ-ইতিহাস ভারতের গৌরবের ইতিহাস। ইতিহাস বলা শেষ হইলে, আমার অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক কথা আপনারা শুনিতে চান, শুনিবেন; আর না শুনিতে চান, না শুনিবেন।

দশদিন

"বুদ্ধদেব-বুদ্ধত্বলাভ করিবার পর জগতে স্বোদ্‌ভাবিত ধর্ম্ম-প্রচার করিবার জন্য সমুৎসুক হন। তিনি তাঁহার পাঁচজন পূর্ব্বতন সঙ্গীর (সহধর্ম্মানুষ্ঠায়ীর) কথা স্মরণ করিলেন। এই পাঁচজন সঙ্গীর নাম কৌণ্ডিন্য, ভদ্রজিৎ, বাষ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ। ইঁহারা সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং প্রায়শঃ "ভদ্রবর্গীয়" পঞ্চক নামে অভিহিত হইতেন। বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন, এই পাঁচজন ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি তখন বারাণসী নগরীর মৃগদাব নামক ঋষিপত্তনে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধদেব স্বীয় ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথমে এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের নিকট প্রচার করিবার জন্য বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর অষ্টম সপ্তাহে বারাণসী যাত্রা করিলেন।

বারাণসী গমনকালে আজীবক :সম্প্রদায়ের কোন দার্শনিকের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎকার হয়। উভয়ের মধ্যে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ের কথোপকথন হয়। পরিশেষে আজীবক জিজ্ঞাসা করেন—"হে গৌতম, তুমি কোথায় যাইবে?" বুদ্ধ বলিলেন—

"বারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকাং পুরীম্।
ধর্ম্মচক্রং প্রবর্ত্তিষ্যে লোকেষ্বপ্রতিবর্ত্তিতম্।"

"আমি বারাণসীতে গমন করিব। কাশিকাপুরীতে গমন করিয়া সংসারে অপ্রতিহত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিব।"

তখন আজীবক শ্লেষ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "হে গৌতম, আমি প্রস্থান করিলাম।" এই কথা বলিয়া আজীবক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন এবং তথাগত উত্তরদিকে অগ্রসর হইলেন।

দশদিন

কিয়ৎকাল পরে তথাগত বারাণসীর মৃগদাব নামক ঋষিপত্তনে উপস্থিত হন। পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ দূর হইতে তথাগতকে দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি তপস্যা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন; অতএব ইঁহাকে সবিশেষ অভ্যর্থনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা নিজ নিজ আসনে বসিয়া থাকি; তিনি আসিয়া স্বয়ংই একখানি আসন লইয়া বসিবেন।" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন তথাগত তাঁহাদের সমীপে আগমন করিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহার তেজঃপুঞ্জ সন্দর্শন করিয়া কম্পিত-কলেবরে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তখন তাঁহাদের সহিত তথাগতের বিবিধ ধর্ম্মালাপ হইল। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গৌতম, আপনার দেহকান্তি সুবিমল হইয়াছে। আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে। আপনি কোন অলৌকিক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন কি?" তথাগত উত্তর করিলেন, "আমি অমৃতসাক্ষাৎ করিয়াছি, অমৃতগামী-পথ আমার নয়নগোচর হইয়াছে। আমি বুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও নিষ্পাপ। আমার জন্মের ক্ষয় হইয়াছে, আমি ব্রহ্মচর্য্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ তথাগতের চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবন! দোষ মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করুন।"

দশমদিন

তদনন্তর অকস্মাৎ সপ্তরত্নময় শত-আসন প্রাদুর্ভূত হইল। তথাগত একখানি আসনে উপবেশন করিলেন; পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোভাগে আসীন হইলেন। সেই সময়ে তথাগতের শরীর হইতে আভা নির্গত হইয়া এই পৃথিবীর ন্যায় সহস্র সহস্র পৃথিবীকে সমুদ্‌ভাসিত করিল। যেথানে কথনও চন্দ্র বা সূর্য্যের উদয় হয় না, এমন মহান্ধকারপূর্ণ নরকসমূহও আলোকিত হইয়া উঠিল। পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। এ এক অসাধারণ ভূমিকম্প। নরকের জীবগণও দুঃখহীন হইয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরের প্রতি রাগ, দ্বেষ, মোহ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য, মান, মদ, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। স্বর্গ হইতে দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হে ভগবন্! এই বারাণসীতে আসীন হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করুন।" তথাগত রাত্রির প্রথমভাগে ধ্যাননিবিষ্ট থাকিলেন, মধ্যমভাগে নানা কথালাপ করিলেন এবং শেষভাগে পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন।" (বুদ্ধ-দেব ১১২।১৩ পৃ)

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান বারাণসীর পবিত্র স্থানগুলির নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন।

নগরের উত্তরপূর্ব্বে দশ লি দূরে মৃগদাব সঙ্ঘারাম অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থলে একজন প্রত্যেকবুদ্ধ বাস করিতেন; এই হেতু ইহার নাম ঋষিপত্তন হইয়াছে। যে স্থলে বুদ্ধদেবকে আসিতে

দেখিয়া কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পঞ্চব্যক্তি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সসম্ভ্রমে দণ্ডায়-মান হইয়াছিলেন, সেই স্থলে লোকে পরে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং নিম্নলিখিত স্থল কয়টীর উপরেও স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১। পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে ষষ্টিপদ উত্তরে যে স্থলে বুদ্ধদেব পূর্ব্বাস্য হইয়া কৌণ্ডিন্য প্রভৃতিকে দীক্ষিত করিবার জন্য ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

২। এই স্থল হইতে বিংশতি পদ উত্তরে যে স্থলে বুদ্ধদেব মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

৩। এই স্থলের পঞ্চাশৎ পদ দক্ষিণে যে স্থলে বুদ্ধদেবকে এলাপত্রনাগ তাহার নাগজন্ম হইতে মুক্তির বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিল।

উপবনের মধ্যে দুইটী সঙ্ঘারাম আছে এবং উহাতে অদ্যাপি ভিক্ষুগণ বাস করিয়া থাকেন।

ইহার প্রায় ২২০ বৎসর পরে আর একজন পরিব্রাজক হিউ-য়েন্-থসং বারাণসী দর্শন করেন। নগর-বর্ণনকালে তিনি বলিয়া-ছেন যে, বারাণসীতে অধিকাংশ ব্যক্তিই মহেশ্বরদেবের উপাসক। তাঁহার বৌদ্ধকীর্ত্তি-সমূহের বর্ণনা, ফাহিয়ানের বর্ণনা অপেক্ষা প্রাঞ্জলতর—

"রাজধানীর উত্তরপূর্ব্বে বরণানদীর পশ্চিমে অশোকরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। ইহা প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ, ইহার সম্মুখে একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে। বরণানদীর উত্তরপূর্ব্বে

দশ লি দূরে লুয়ে-(মৃগদাব) সঙ্ঘারাম অবস্থিত। ইহা আট ভাগে বিভক্ত এবং প্রাচীর-বেষ্টিত। এই স্থলে হীনযান সম্মতীয় মতাবলম্বী পঞ্চদশশত ভিক্ষু বাস করেন। প্রাচীরবেষ্টনের মধ্যে ২০০ ফিট উচ্চ একটী বিহার আছে। এই বিহারের ভিত্তি ও সোপানাবলী প্রস্তর-নির্ম্মিত, কিন্তু উপরিভাগ ইষ্টক-নির্ম্মিত। এই বিহারের মধ্যে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনমুদ্রায় অবস্থিত তাম্রনির্ম্মিত একটী বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বিহারের দক্ষিণপশ্চিমে রাজা অশোককর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী প্রস্তরস্তূপ আছে। ইহার ভিত্তি ভূমগ্ন হইলেও ইহা অদ্যাপি ১০০ ফুট উচ্চ আছে, এই স্থলে ৭০ ফুট উচ্চ একটী প্রস্তর-স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের প্রস্তর স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল। ইহার সম্মুখে যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করে, তাহারা সময়ে-সময়ে ইহাতে তাহাদিগের প্রার্থনামত শুভ বা অশুভ চিহ্ন দেখিতে পায়। এই স্থলে তথাগত সংবুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন।

এতদ্ব্যতীত হিউয়েন্-থসং অনেক স্তূপের বর্ণনা করিয়াছেন; তাহার মধ্যে প্রধানগুলি দেওয়া হইল। এই স্থলের নিকটে যেখানে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ভবিষ্যতে সংবুদ্ধ হইবার আশ্বাস প্রাপ্ত হন, সেখানে একটী স্তূপ আছে। প্রাচীনকালে তথাগত যখন রাজগৃহে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি ভিক্ষুগণের প্রতি এইরূপ উক্তি করেন "ভবিষ্যৎকালে যখন এই জম্বুদ্বীপ শান্তিপূর্ণ হইবে, তখন মৈত্রেয় নামক এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার শরীর

পবিত্র স্থবর্ণাভ হইবে। তিনি গৃহত্যাগপূর্ব্বক সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইবেন, এবং সর্ব্বজীবের উপকারার্থ ত্রিবিধ ধর্ম্ম প্রচার করিবেন।” এই সময় মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব স্বকীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া বুদ্ধকে বলিলেন যে, “আপনি অনুমতি করুন, আমিই যেন সেই মৈত্রেয় বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করি।” ইহাতে বুদ্ধদেব উত্তর করেন যে, তাহাই হইবে। সঙ্ঘারামের পশ্চিমে একটী পুষ্করিণী আছে। এই-স্থানে তথাগত সময়ে-সময়ে স্নান করিতেন। ইহার পশ্চিমে আর একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই স্থলে তথাগত ভিক্ষাপাত্র প্রক্ষালন করিতেন। ইহার উত্তরে আর একটী হ্রদ আছে। এই স্থলে তথাগত বস্ত্রক্ষালন করিতেন। ইহার পার্শ্বে একখণ্ড বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রস্তর আছে। ইহাতে এখনও বুদ্ধের কাষায়বস্ত্রের চিহ্ন আছে। এই স্থল হইতে অনতিদূরে এক মহারণ্যের মধ্যে একটী স্তূপ আছে। এই স্থলে দেবদত্ত এবং বোধিসত্ত্ব অতীতকালে মৃগযূথপতি ছিলেন। দুইটী বিভিন্ন যূথ ছিল, প্রত্যেক যূথে ৫০০ শত মৃগ ছিল। এই সময়ে ঐ দেশের রাজা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন। যূথপতি বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, “মহারাজ! আপনি অরণ্যের স্থানে স্থানে অগ্নিসংযোগ করেন এবং শর নিক্ষেপপূর্ব্বক আমার দলস্থ সমুদয় মৃগ নিহত করেন; কিন্তু পুনঃ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সে সমস্ত আহারের অযোগ্য হয়। আমরা প্রত্যহ একটি করিয়া মৃগ আপনার আহারার্থ উপস্থিত করিব। ইহাতে আপনিও প্রত্যহ সদ্যোমাংস পাইবেন, এবং আমাদের জীবনকালও এক-

দিবস বৰ্দ্ধিত হইবে।” রাজা এই প্রস্তাবে হৃষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে প্রত্যেক দল হইতে প্রতিদিন এক একটী মৃগ নিহত হইত। একদিন দেবদত্তের যূথ হইতে একটী গর্ভবতী মৃগী নির্ব্বাচিত হইলে, মৃগী তাহার স্বামীকে বলে যে “যদিও আমার মৃত্যু নিশ্চিত, তথাপি আমার গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় নাই।” ইহা শ্রবণে যূথপতি দেবদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করেন যে, “উহার জীবন কাহার নিকট মূল্যবান্?” মৃগী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিল, “হে রাজন্! অজাত শিশুকে বধ করা দয়াশীলতার কার্য্য নহে।” মৃগী এই বিপদে অপর যূথপতি বোধি-সত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিনি দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া মৃগীর পরিবর্ত্তে স্বদেহ উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রাসাদাভিমুখে গমনকালে তাঁহাকে দর্শন করিয়া জনসমূহ বলিতে লাগিল যে, মৃগযূথপতি নগরে আগমন করিতেছে। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নগরবাসিগণ ও রাজকর্ম্মচারিগণ দ্রুতপদে আগমন করিল। রাজা তাঁহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, “তুমি এস্থলে কি জন্য আগমন করিয়াছ?” মৃগযূথপতি উত্তর করিলেন যে “দলমধ্যে একটী গর্ভবতী মৃগী বধার্থ নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমি তাহার স্থলে আপনার আহারার্থ আসিয়াছি।” রাজা শুনিয়া দৈনিক উপহার চিরকালের নিমিত্ত প্রত্যাখ্যান করিলেন, এবং ঐ বন মৃগ-যূথের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রদান করিলেন। সেই সময় হইতে ঐ বন মৃগদাব নামে খ্যাত।

দশদিন

সঙ্ঘারাম হইতে ২।৩ লি দক্ষিণপশ্চিমে ৩০০ শত ফুট উচ্চ অপর একটি স্তূপ আছে।

খৃষ্টীয় ১৮৬১ অব্দে General Cunningham বারাণসীর প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে বর্ত্তমান যুগে সারনাথে ও বারাণসীতে যে যে প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে সঙ্কলিত হইল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কাশীর মহারাজের দেওয়ান বাবু জগৎসিংহ স্বনামে বারাণসীর একটী মহল্লা নির্ম্মাণকালে চতুর্দ্দিকের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহ হইতে নির্ম্মাণ-উপাদান সংগ্রহ করেন। এই সময়ে সারনাথের অনেকগুলি স্তূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত ১৮৩৫ খৃঃ Gen. Cunningham ধামেক নামক স্তূপ খনন করান। পরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে Major Kittoe কতকাংশ খনন করান।

সারনাথ বারাণসীর উত্তরপশ্চিমে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত একটী গ্রামের নাম। কাশীতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ-ধ্বংসাবশেষগুলির অধিকাংশই ঐ স্থলে অবস্থিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয় বৎসর হইতেই সারনাথের উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সারনাথের ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে কানিংহাম নিম্নলিখিতগুলি প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

১। ধামেক নামক প্রস্তরনির্ম্মিত স্তূপ।

২। বাবু জগৎসিংহ কর্ত্তৃক খনিত একটী বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত স্তূপ।
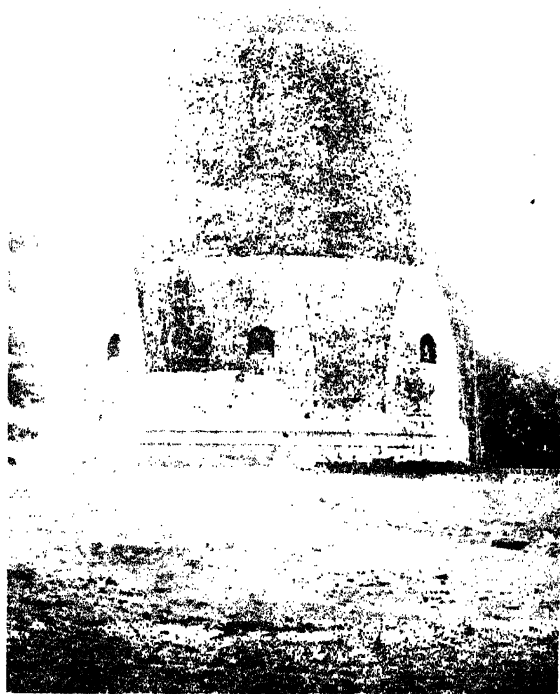
৩। কানিংহামের নিজের খনিত স্থল।

৪। মেজর কীটো কর্ত্তৃক খনিত স্থল।

৫। ধামেক হইতে অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত চৌখণ্ডী নামক একটী বৃহৎ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ।•

ধামেক স্তূপটী সর্ব্বজনপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। বহু পুস্তকে ইহার বিবরণ ও চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ভিত্তি হইতে ১১০ ফুট এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতে মোট ১২৮ ফুট উচ্চ। ইহার ভিত্তি বৃহদাকার প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত। এই ভিত্তি চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতলভূমির ১০ ফুট নিম্ন হইতে গ্রথিত। ভিত্তির উপরে ইহা ৪৩ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্তর এবং ইহার উপরাংশ ইষ্টক-নির্ম্মিত। প্রস্তরনির্ম্মিতাংশে অনেক খোদিত কারুকার্য্য আছে। তাহার কিয়দংশ অসম্পূর্ণ। কানিংহাম সাহেব ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে খননকালে, ইহার মধ্যে ১ খণ্ড প্রস্তরে "যে ধর্ম্মহেতুপ্রভবা" ইত্যাদি বৌদ্ধমন্ত্রযুক্ত খোদিতলিপি প্রাপ্ত হন। সেই প্রস্তরখণ্ড এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। উক্ত সাহেবের মতে এই ধামেক নামটী "ধর্ম্মোপদেশক" বা "ধর্ম্মদেশক" শব্দের অপভ্রংশ।

ধামেক হইতে ৫২০ ফুট পশ্চিমে একটী বৃহৎ গোলাকার গর্ত্ত, ও গর্ত্তের চারিপার্শ্বে প্রায় ১৫ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তি আছে। ইহাই দেওয়ান জগৎসিংহ কর্ত্তৃক খনিত স্তূপ। ইহা পরে জগৎসিংহের স্তূপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জগৎ-সিংহের অনুচরগণ এই স্তূপখননকালে একটী বৃহৎ প্রস্তর-

নির্ম্মিত আধার প্রাপ্ত হয়। এই আধারের মধ্যে অপর একটী ক্ষুদ্রতর মর্ম্মরাধারে কতকগুলি অস্থিখণ্ড, মুক্তা, স্বর্ণপাত্র, প্রবাল ও অন্যান্য মণি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।*

এতদ্ব্যতীত এই স্থলে আর একটী বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। এই মূর্ত্তির পদতলে বঙ্গের পালবংশীয় বিখ্যাত রাজা মহীপালের খোদিতলিপি আছে। এই বুদ্ধমূর্ত্তিটী এক্ষণে লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে; ক্ষুদ্রতর মর্ম্মরাধারটী বহুদিন নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বৃহত্তর আধারটী কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

কানিংহাম ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে খননকালে একখণ্ড সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরময় তোরণের অংশ প্রাপ্ত হন। ইহা এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র মন্দিরাকার গৃহ খোদিত; একটীতে দীপঙ্কর বুদ্ধের উপাখ্যান এবং অপরটীতে বুদ্ধ ও মলয়গিরি নামক হস্তীর উপাখ্যান খোদিত আছে। ইহার মধ্যভাগে অপর একটী মন্দিরাকার গৃহে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণচিত্র উৎকীর্ণ। মধ্যস্থ মন্দিরের নিম্নে ও উভয় পার্শ্বস্থ মন্দির দুইটীর ব্যবধানে কতকগুলি হিন্দু-দেবতার মূর্ত্তি খোদিত আছে। মকরারূঢ় বরুণ, ঐরাবতে ইন্দ্র, মহিষবাহনে যম ও কেতু, নিম্নে গরুড়বাহন বিষ্ণু, হংসারূঢ় চতুরাস্য ব্রহ্মা ও শ্মশ্রুযুক্ত বৃষভারূঢ় মহেশ্বর, ময়ূরবাহন কার্ত্তিক

---

* Jonathan Duncan, Asiatic Researches vol v p I31.

ও মূষিকবাহন গজাননের মূর্ত্তি চিনিতে পারা যায়। তোরণের নিম্নের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়াছে।*

মেজর কীটো খননকালে কতকগুলি মঠভিত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কানিংহাম সাহেবও সারনাথের নিকটস্থ বরাহীপুর গ্রামের সন্নিকটে একটী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের পার্শ্বে ৫০।৬০ খণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে কতকগুলি তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রদান করেন, অবশিষ্টগুলি ডেভিড্‌সন্ নামক একজন Engineer সাহেব বরণা নদীর উপরিস্থ সেতু-নির্ম্মাণকালে উক্ত নদীর স্রোত রোধ করিবার জন্য নদীতে নিক্ষেপ করেন। এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রদত্ত মূর্ত্তিগুলি কলিকাতা মিউজিয়মে আছে; তন্মধ্যস্থ প্রধানগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল।

১। সপ্তখণ্ডে বিভক্ত একখানি প্রস্তরফলক। ইহার উপরাংশ ভগ্ন। প্রত্যেক খণ্ডে বুদ্ধদেবের জীবনের এক একটী প্রধান ঘটনার চিত্র খোদিত। সর্ব্বনিম্নে বুদ্ধদেবের জন্মচিত্র। এক হস্তে শালবৃক্ষের শাখা ও অপর হস্ত দ্বারা সখীর স্কন্ধে ভর দিয়া মায়াদেবী দণ্ডায়মানা। বুদ্ধদেব কটিদেশ হইতে নির্গত হইতেছেন; ব্রহ্মা একখণ্ড বস্ত্রের উপরে তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছেন। ইন্দ্র জলপাত্র হস্তে ব্রহ্মার পার্শ্বে দণ্ডায়মান; আকাশে ও ভূতলে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ। ইহার উপরে একটী চিত্রে

* Cunningham's Report on the Archaeological survey of India Vol i p. 120.

বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতেছেন। উভয় পার্শ্বে চামরহস্তে অনুচরগণ দণ্ডায়মান। আকাশে মাল্যহস্তে গন্ধর্ব্বগণ ও বুদ্ধদেবের নিম্নে একটী ধর্ম্মচক্র ও উহার উভয় পার্শ্বে তিনটী করিয়া যুক্তকর উপাসক নতজানু হইয়া উপবিষ্ট। ইহার পার্শ্বে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধদেব, চতুষ্পার্শ্বে গন্ধর্ব্ব উপাসকগণ বিদ্যমান। ইহার উপর আর একটী চিত্রে কয়েকটী সোপানের উপরে বুদ্ধদেব দণ্ডায়মান। বুদ্ধদেব ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গ হইতে তাঁহার মাতার নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিয়া এই সোপানাবলি দ্বারা ভূতলে অবতরণ করিতেছেন। এক পার্শ্বে ছত্রধারী ইন্দ্র ও অপর পার্শ্বে ব্রহ্মা এবং ভূতলে নতজানু উপাসকমণ্ডলী! এইরূপ একটী চিত্র কানিংহাম সাহেব ভরহুত স্তূপের রেলিংএ প্রাপ্ত হন এবং অপর একখানি চিত্র Mr. A. C Caddy * সাহেব স্বাত নদীর উপত্যকায় প্রাপ্ত হন। এই উভয় প্রস্তরখণ্ডই এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে। ইহার পার্শ্বে আর একটী চিত্রে পদ্মাসনে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্রমুদ্রায় উপবিষ্ট। এই চিত্রের অধিকাংশই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বিশেষ কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না।

২। এই প্রস্তরখণ্ড আকারে পূর্ব্ববর্ণিত প্রস্তরখণ্ডের অনুরূপ; ইহাতেও চারিটী বিভাগ বিদ্যমান ও বুদ্ধের জন্ম, সম্বোধি, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন ও মৃত্যু, এই চারিটী চিত্র খোদিত; পার্শ্বে নানা অবস্থায় নানাবিধ খোদিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে।

* Proceedings Asiatic Society of Bengal 1898.

চৌখণ্ডী স্তূপ (সারনাথ)
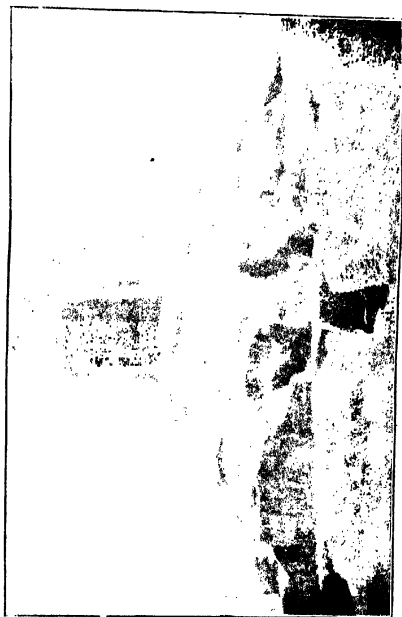
৩। এই প্রস্তরখণ্ডে চারিটী সমানাকার বিভাগে পূর্ব্বোক্ত চারিটী চিত্র খোদিত আছে।

৪। ইহাতে তিনটী চিত্র আছে; প্রথমটিতে বজ্রাসনের উপরে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বুদ্ধদেব; উভয় পার্শ্বে চামরধারী নাগ ও মনুষ্যগণ এবং নিম্নে কতকগুলি আনন্দবিহ্বলা নারীমূর্ত্তি খোদিত। ইহার উপরে ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের চিত্র ও তদুপরি বুদ্ধের ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গ হইতে অবতরণের চিত্র। সর্ব্বনিম্নে ভিক্ষু হরিগুপ্তের দানবিষয়ক এক পংক্তি খোদিতলিপি আছে।

৫। এই ফলকে নানা অবস্থায় নানা মুদ্রায় অবস্থিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট পঞ্চশ্রেণী বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে।

এতদ্ব্যতীত অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি, বহুসংখ্যক বুদ্ধমূর্ত্তি কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

মেজর কীটো খননকালে একটী সঙ্ঘারামের ভিত্তি এবং কানিংহাম সাহেব বরাহীপুর গ্রামের নিকটে একটী সঙ্ঘারাম ও একটী মন্দিরের ভিত্তি প্রাপ্ত হন। * ইহার পরে কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক Dr Fitzedward Hall সাহেব কতকাংশ খনন করান; কিন্তু বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন নাই। কানিংহাম সাহেব উক্ত রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, সারনাথের খনন অনাবশ্যক।

---

* Arch Sur Rept 1 plates xxxii and xxxiii.

দশদিন

ধামেক হইতে ২৫০০ হাজার ফুট দক্ষিণে চৌখণ্ডিনামক একটী স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে। জেনারেল কানিংহাম ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থল খনন করেন। ইহার উপরে একটী অষ্টকোণ বুরুজ আছে। এই বুরুজের দ্বারের উপরিস্থ একখণ্ড শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, বাদসাহ হুমায়ুনের উক্ত স্থান পরিদর্শনের স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ এই বুরুজ নির্ম্মিত হয়। গত ৪০ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে সারনাথে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয় নাই। Dr, J, F, Fleet তাঁহার Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol III গ্রন্থে সারনাথ-প্রাপ্ত গুপ্তাক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিপি প্রকাশ করেন।

ইহা এখন কোন্ স্থানে আছে বলা যায় না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সারনাথের ইঞ্জিনিয়ার Mr, F Oertel সাহেব খনন আরম্ভ করেন। গবর্ণমেণ্ট এজন্য প্রথমে ৫০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন, কিন্তু খননটী আশাতিরিক্ত ফলদায়ক হওয়ায় পুনরায় ১০০০ সহস্র মুদ্রা খননার্থ প্রদান করেন। খননে নিম্নলিখিত আবিষ্কার হইয়াছে।

১। একটী মন্দিরের ভিত্তি।

২। মহারাজ কনিষ্কের সময়ের একটী বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি, প্রস্তর ছত্র, ও স্তম্ভগাত্রস্থ খোদিতলিপি।

৩। মহারাজ অশোকের একটী স্তম্ভলিপি, স্তম্ভের ভগ্নাংশ ও স্তম্ভফলক।

৪। একটী বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি ও রাজা অশ্বঘোষের একখানি খোদিতলিপি।

৫। বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি। *

প্রায় ২০০ বর্গফুটস্থান খনন করা হইয়াছে। এই স্থান জগৎ-সিংহের স্তূপের উপরে অবস্থিত! কানিংহাম তাঁহার মানচিত্রে যে স্থল কীটো কর্ত্তৃক বর্ণিত স্তূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই স্থলে উপরিউক্ত মন্দিরের ভিত্তিটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববর্ণিত চৌখণ্ডি নামক স্তূপের ধ্বংসাবশেষটিও খনিত হইয়াছে। জগৎসিংহের স্তূপের ২০০ শত ফুট উত্তরে উপরিউক্ত মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা আকারে কানিংহাম কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মন্দিরের অনুরূপ। † ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৯৫ ফুট। মন্দিরের প্রধান দ্বার পূর্ব্বদিকে। তিনটী সোপান আরোহণ করিলে দ্বারের উপরে উপস্থিত হওয়া যায়। এই স্থলে কতকগুলি চতুষ্কোণ খোদিত প্রস্তর আছে। এই গুলির কোন ভাগে বুদ্ধমূর্ত্তি, কোন ভাগে ধর্ম্মচক্র ও উহার উভয় পার্শ্বে মৃগ ও উপাসকমণ্ডলী, কোন অংশে চৈত্য ইত্যাদি নানা প্রকার চিত্র খোদিত আছে। প্রধান দ্বার অতিক্রম করিলে প্রাঙ্গণে উপনীত হওয়া যায়। প্রাঙ্গণটী ৩৯ফুট দীর্ঘ

---

* A. Report, Vol, I. plate No xxxII,

† A. Rept, 1. plate xxxiii.

ও ২৩ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট। প্রাঙ্গণের উভয় পার্শ্বে এক একটী গৃহ আছে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমে একটী উচ্চ স্থল আছে; এই স্থলে চতুষ্কোণ প্রস্তরনির্ম্মিত দুইটী স্তম্ভ আছে। এই দুইটী প্রায় ৭ফুট উচ্চ। এই উচ্চ স্থলের পশ্চিম পার্শ্বে মন্দিরের অন্তরালের ভিত্তি আছে। ভিত্তির মধ্যভাগে দুইটী চতুষ্কোণ প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভের মধ্যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির আসন আছে। ইঁহা কতকটা 'কুলুঙ্গির' আকারের। ইহার চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণের স্থান আছে। এই প্রদক্ষিণের পথ অতি সঙ্কীর্ণ; কোন স্থলে ১।০ ফুট প্রস্থ। এই স্তম্ভ দুইটীর পশ্চিম পার্শ্বে একটী ৪ ফুট প্রস্থ গৃহ আছে। এই গৃহের পশ্চিমে আর একটী ক্ষুদ্রতর গৃহ আছে, এই গৃহটীতে মন্দিরের প্রধান দ্বার দিয়া প্রবেশ করা যায় না। মন্দিরের অপর তিনদিকে আরও তিনটী দ্বার আছে। প্রাঙ্গণের উভয় পার্শ্বস্থ দুইটী গৃহে উত্তর ও দক্ষিণস্থ দ্বার দিয়া প্রবেশ করা যায়। পশ্চিমস্থ দ্বার দ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষুদ্রতর গৃহে যাওয়া যায়। মন্দিরের অন্তরালস্থ স্তম্ভ দুইটীর ব্যবধান ১৭ ফুট; ইহার পশ্চিমের বড় গৃহটী ২৮ ফুট দীর্ঘ, অপর দ্বারগুলির সন্নিহিত গৃহগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও তিনটী প্রায় সমানাকার। উত্তরস্থ গৃহটী ৭ ফুট, পশ্চিমস্থ গৃহটী ১০।।০ ফুট এবং দক্ষিণস্থ গৃহটি ৮।।০ ফুট দীর্ঘ। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে প্রায় ৫০ ফুট স্থান পরিস্কৃত হইয়াছে। এই স্থলে ক্ষুদ্র উপলখণ্ডনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের ভিত্তি ও

প্রাচীরের কিয়দংশ প্রস্তরনির্ম্মিত। এই অংশ ও পূর্ব্ববর্ণিত স্তম্ভ-চতুষ্টয় ব্যতীত মন্দিরের অপর সমুদয় অংশই দীর্ঘাকার ইষ্টকনির্ম্মিত; কিন্তু স্থলে স্থলে খোদিতপ্রস্তর দেখিলে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, এগুলি বর্ত্তমান মন্দিরে ব্যবহারের নিমিত্ত খোদিত হয় নাই। কোন প্রস্তরখণ্ডে কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি, কোন স্থলে এক শ্রেণী হংস বা কতকগুলি পদ্ম খোদিত আছে। এতদ্‌ব্যতীত অনেক স্থলে ক্ষুদ্র প্রস্তরনির্ম্মিত চৈত্যের ভগ্নাংশ নির্ম্মাণকালে ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি মস্তকবিহীন ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় অবস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। ইহা প্রায় ৪ ফুট উচ্চ এবং ইহার পশ্চাতেও তিনি শ্রেণীতে ৬টি চৈত্য খোদিত আছে। ইহার নিম্নে একটি চিত্র খোদিত আছে। একটী গৃহের গবাক্ষে একটী সিংহের মুখ দেখা যাইতেছে এবং গৃহের বাহিরে গবাক্ষের এক পার্শ্বে একটী স্ত্রীলোক ও একটী বালক যুক্তকর ও নতজানু অবস্থায় রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে একটী স্ত্রীলোক নৃত্য করিতেছে। এই দৃশ্যটির উপরে একটী খোদিতলিপি আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, এই মূর্ত্তি স্থবির বন্ধুগুপ্তের দান। এতদ্‌ব্যতীত মন্দিরের পূর্ব্বে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাঙ্গণের দক্ষিণস্থ গৃহে একটী মস্তকহীন বুদ্ধমূর্ত্তি অদ্যাপি অধিষ্ঠিত আছে। অন্য স্থান অপেক্ষা মন্দিরের এই অংশের প্রাচীর উন্নত; দক্ষিণ দ্বারের উভয় পার্শ্বস্থ প্রাচীর অদ্যাপি ১২ ফুট উচ্চ। এই গৃহের পশ্চিম প্রাচীরের নিম্নে একটী অতি প্রাচীন স্তূপ আবিষ্কৃত

হইয়াছে; এই স্তূপটীর ভিত্তি চতুষ্কোণ এবং ইহা ইষ্টকনির্ম্মিত ইহার চতুষ্পার্শ্বে সাঞ্চী ও ভারতের স্তূপের রেলিংএর ন্যায় এক প্রস্তরনির্ম্মিত রেলিং আছে। এই রেলিং সমচতুষ্কোণ, ইহার এক পার্শ্ব দৈর্ঘ্যে ৮৷৷০ ফুট। ইহা এক্ষণে ভগ্ন হইয়াছে। ইহার গাত্রে ২।৩টি অক্ষর খোদিত দেখা যায়, কিন্তু উহা পাঠ করা দুষ্কর। এই স্তূপটির উপরাংশ গোলাকার। স্তূপের উপরে প্রায় ১০ ফুট্ উচ্চ এবং ২১ ফুট্ প্রস্থ বিশাল ইষ্টকনির্ম্মিক প্রাচীর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। খননকালে দেখা গিয়াছিল যে, এই প্রাচীর-নির্ম্মাণকালে স্তূপ ও রেলিং অতি সাবধানে ইষ্টক দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। নির্ম্মাণকর্ত্তা স্বচ্ছন্দে উহা ভগ্ন করিতে পারিতেন, তথাপি তিনি উহা অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, স্তূপটি বোধ হয় সে সময়ে প্রগাঢ় ভক্তির বস্তু ছিল; এই নিমিত্ত দেবতার ভয়ে উহা রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণে উপর্য্যুপরি নির্ম্মিত কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ উদাহরণ স্বরূপ খননকালে রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে ৪৫ ফুট্ দীর্ঘ একটি ভিত্তি আছে, ইহা খনিত স্থলের পূর্ব্বসীমা। ইহার পশ্চিমে দুইটি ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিত্তি আছে। ইহার পরে কতকগুলি মধ্যমাকার স্তূপের ভিত্তি আছে। এ সমুদয় ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহার পশ্চিমে উদাহরণ স্বরূপ উপর্য্যুপরি নির্ম্মিত ৪টি ইষ্টকময় স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহার পশ্চিমে দুইটি ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিত্তি। তাহার একটীতে কুটিলাক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিপি পাওয়া

গিয়াছে। অক্ষরগুলি অত্যন্ত ক্ষয় হইয়াছে বলিয়া ইহার পাঠোদ্ধার অসম্ভব। ইহার পশ্চিমে খনিত স্থলের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত সমুদয় স্থল স্তূপ ও স্তূপভিত্তিতে পরিপূর্ণ। পূর্ব্ববর্ণিত উপর্য্যুপরি নির্ম্মিত স্তূপচতুষ্টয়ের অব্যবহিত দক্ষিণে পূর্ব্বোক্ত মহারাজ কনিষ্কের সময়ের একটী বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি, প্রস্তরছত্র ও স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। স্তম্ভটী এখনও প্রাপ্তিস্থলে দৃষ্ট হইবে। বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি ও ছত্রটী নূতন মিউজিয়মের প্রাঙ্গণে রক্ষিত হইয়াছে। স্তম্ভগাত্রে ১০ পংক্তি খোদিতলিপি আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে মহারাজা কনিষ্কের তৃতীয় সংবৎসরে হেমন্তের ৩য় মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে ভিক্ষু বল ত্রৈপিটক ও পুষ্যবুদ্ধি কর্ত্তৃক বুদ্ধিমিত্র নামক ব্যক্তির সাহায্যে খরপল্লন ও বনস্পর নামক ক্ষত্রপদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে এই মূর্ত্তি, ছত্র ও স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। ছত্রটী ভগ্ন হওয়ায় বহু খণ্ড হইয়াছে। মূর্ত্তি ও স্তম্ভ তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। স্তম্ভের নিম্নাংশ প্রায় ৬ ফুট উচ্চ। এই অংশটী প্রাপ্তিস্থলে রক্ষিত আছে। ইহা অষ্টকোণ। ইহার তিন কোণ ব্যাপিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ১০ পংক্তি খোদিতলিপি। বর্ত্তমান, মধ্যের অংশ দ্বাদশ কোণ, ইহা প্রায় ২॥ ফুট উচ্চ এবং অপরাংশ গোলাকার এবং ২ ফুট উচ্চ ; স্তম্ভটী সর্ব্ব-সমেত প্রায় দ্বাদশ ফুট উচ্চ। বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিটীর পদতলে দুই পংক্তি খোদিতলিপি এবং পশ্চাদ্ভাগে ৪ পংক্তি খোদিতলিপি আছে। এই চারি পংক্তি খোদিতলিপি স্তম্ভগাত্রের খোদিতলিপির প্রথম চারি পংক্তির অনুরূপ। Dr. Vogel অনুমান করেন যে, মূর্ত্তির

পশ্চাতে খোদিতলিপির অস্তিত্বে ইহা প্রমাণ হইতেছে যে, সে সময়ে দেবমূর্ত্তিসমূহ বর্ত্তমান কালের ন্যায় মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন হইত না।* মন্দিরের ও জগৎসিংহের স্তূপের মধ্যস্থ সমুদয় স্থল খনিত হইয়াছে। এই স্থানে নানাবিধ প্রস্তর বা ইষ্টকনির্ম্মিত উভয় প্রকারের অসমানাকার স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। জগৎসিংহের স্তূপের চতুষ্পার্শ্ব খননকালে স্তূপপ্রদক্ষিণের ইষ্টকনির্ম্মিত পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কানিংহামের মানচিত্রে জগৎসিংহের স্তূপের চারিপার্শ্বে যে চারিটী ঢিপি বা মৃৎস্তূপ অঙ্কিত আছে, তাহার মধ্যে দক্ষিণের ঢিপি ব্যতীত অপর তিনটী খননকালে অপসারিত হইয়াছে। এই ঢিপিটির পশ্চিমে প্রাচীন স্তূপগুলির অনুকরণে Oertel সাহেব একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা একটি প্রাচীন ভিত্তির উপর নির্ম্মিত। ইহার গাত্রে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এই অঙ্কসম্বলিত একখানি খোদিত প্রস্তর গ্রথিত আছে। ইহার খনিত ভূমির দক্ষিণসীমা। কানিংহামের মানচিত্র হইতে দৃষ্ট হইবে যে, জৈনমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে একটি ঢিপি আছে। উহার উপর নূতন মিউজিয়মটি নির্ম্মিত হইয়াছে। খননকালে এত অধিক দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে যে, এই মিউজিয়মে সে সমুদয়ের স্থান হওয়া অসম্ভব। এই জন্য প্রস্তাব হইয়াছে যে, ঐ মিউজিয়মে বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি রাখিয়া অপর অর্থাৎ

*Annual Progress Report of the Superintendent of the Archaeological Survey of the United Provinces and Panjab 1905, p. 57.

হিন্দু ও জৈনমূর্ত্তিগুলি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে রাখা হইবে। ইহার পশ্চিমে কিটো কর্ত্তৃক খনিত সঙ্ঘারামের প্রাঙ্গণস্থিত প্রাচীন কূপটির জীর্ণসংস্কার হইয়াছে।

মন্দিরের পশ্চিমাংশের খনিত ভূভাগ হইতেই বহুতর পুরা-কীর্ত্তি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মন্দিরের পশ্চিমদ্বারের সম্মুখে উহা হইতে দশহস্ত পশ্চিমে মহারাজ অশোকের খোদিতলিপিযুক্ত একটি প্রস্তরস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্তম্ভগাত্রে অশোকের খোদিত লিপি ব্যতীত আরও দুইটি খোদিতলিপি আছে। একটিতে রাজা অশ্বঘোষের চত্বারিংশৎ সংবৎসরের হেমন্তের প্রথম পক্ষের দশম দিবসের উল্লেখ আছে। অপরটি দানবিষয়ক লিপি। এই দুইটি লিপি অপেক্ষাকৃত নূতন অক্ষরে লিখিত। স্তম্ভটি দশফুট গভীর একটি গর্ত্তের মধ্যে অবস্থিত। অশোকের খোদিতলিপির প্রথম তিন পংক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্তম্ভটি ভগ্ন হইয়াছে, গর্ত্তের পার্শ্বে ইহার উপরের অংশ পতিত আছে। গর্ত্তের পার্শ্বে স্তম্ভটি বিদ্যমান আছে। অপরাপর অশোকস্তম্ভের শীর্ষের ন্যায় ইহাতে চারিটি সিংহমূর্ত্তি খোদিত আছে। এই চারিটি সিংহের পৃষ্ঠে একটি ধর্ম্মচক্র অবস্থিত ছিল। ইহা ভগ্ন হইয়াছে, কয়েকটি ভগ্নাংশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্ব খননকালে অনেকগুলি প্রাঙ্গণ আবিষ্কৃত হয়। দশফুট নিম্নে অশোকের সময়ের প্রাঙ্গণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নিম্নস্থ স্তম্ভের সমুদয় অংশ অমার্জ্জিত এবং উপরের অংশ

সুন্দররূপে মার্জ্জিত এবং দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল। অশোকের সময়ের প্রাঙ্গণের উপরে স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তরের রেলিং ছিল। ইহা ঐ স্থল হইতে উত্তোলিত হইয়া মিউজিয়মের প্রাঙ্গণে কনিষ্কের সময়ের বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি ও ছত্রের পশ্চাতে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার উপরে প্রায় ৫ ফুট ঊর্দ্ধে মথুরার খোদিত প্রস্তরসমূহে ব্যবহৃত রক্তবর্ণ চতুষ্কোণ প্রস্তরাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ। তাহার তিন ফুট ঊর্দ্ধে অসমান প্রস্তরখণ্ডনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ ও সর্ব্বোপরি উপলখণ্ড-নির্ম্মিত বর্ত্তমান প্রাঙ্গণ পাওয়া গিয়াছে। স্তম্ভের উত্তরে অর্থাৎ মন্দিরের উত্তরপশ্চিমকোণে কতকগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত স্তূপভিত্তি আছে। এরূপ সুন্দর স্তূপভিত্তি অত্যন্ত বিরল। একটি স্তূপে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি অদ্যাপি সংলগ্ন আছে। এগুলি সম্পূর্ণাবস্থায় দশফুট উচ্চ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। মন্দিরের উত্তরে একটি বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সঙ্ঘারামের মধ্যে একটি চল্লিশ ফুট দীর্ঘ ও আটফুট প্রস্থ গৃহ ছিল। এই গৃহের চতুষ্পার্শ্বে নানা মূর্ত্তি সজ্জিত ছিল। তিনটি সোপান আরোহণ করিলে মূর্ত্তির পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যাইত। একটি মূর্ত্তি অদ্যাপি স্বস্থানে বর্ত্তমান দেখা যায়, এবং ৩।৪ স্থানে সোপান বর্ত্তমান আছে। এইস্থলে রাজা অশ্ব-ঘোষের নাম-খোদিত একখানি প্রস্তরের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছে।

অশোক-স্তম্ভশীর্ষ আটফুট উচ্চ। স্তম্ভের যে অংশ গর্ত্তের পার্শ্বে পতিত আছে, তাহা প্রায় ২০ ফুট দীর্ঘ গর্ত্তের মধ্যে

অবস্থিত, স্তম্ভের অংশ ১২ফুট উচ্চ। খননকালে প্রাপ্ত সমুদয় প্রস্তরমূর্ত্তি মিউজিয়মে এবং উহার প্রাঙ্গণে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণের উত্তরাংশে কনিষ্কের সময়ের বোধিসত্ত্বমূর্ত্তিটি দণ্ডায়মান আছে। মূর্ত্তিটি আবিষ্কারকালে তিন খণ্ড হইয়াছিল, ইহা পুনরায় সংযোজিত হইয়াছে। মূর্ত্তির পশ্চাতে বহুখণ্ড ছত্র রক্ষিত আছে। ছত্রটিতে অনেক খোদিত কারুকার্য্য ছিল; কিন্তু সমুদয়ই প্রায় লোপ পাইয়াছে। ছত্রের পশ্চাতে অশোক-স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বস্থ রেলিং রাখা হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিটির একখানি হস্ত বর্ত্তমান আছে এবং ইহা একাদশ ফুট উচ্চ। মূর্ত্তিটির মুখে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন আছে; নাসিকা, ওষ্ঠ ও কর্ণ ভগ্ন হইয়াছে। মূর্ত্তিটি তিন খণ্ড লৌহের তার দ্বারা বাঁধা আছে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণাংশে একটি জৈন চতুর্ম্মুখ আছে। (একটি বৃক্ষের চারিপার্শ্বে চারিটি তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি থাকিলে জৈনগণ সেই প্রস্তরখণ্ডকে চতুর্ম্মুখাখ্যা প্রদান করেন।) হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণু, গণেশ ও হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি লক্ষ্য হয়। বৌদ্ধমূর্ত্তি অসংখ্য, তন্মধ্যে প্রধানগুলি বর্ণিত হইল। একখণ্ড প্রস্তরে তিনটি মূর্ত্তি খোদিত; ইহার দুইটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীমূর্ত্তি। Gen. Cunningham বুদ্ধগয়ায় এইরূপ একটি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও তাঁহার মহাবোধি নামক পুস্তকে ইহার একটি চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন; ইহা ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘের মূর্ত্তি। সিংহারূঢ়া বীণাহস্তে একটি দেবীমূর্ত্তি, ইহা সম্ভবতঃ মঞ্জুশ্রী

বোধিসত্ত্বের শক্তি বাগীশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি। সপ্তশূকরযোজিত রথারূঢ়া বজ্রবারাহী দেবীর মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। এই দেবীর তিনটি মুখ, তন্মধ্যে একটি মুখ শূকরের ন্যায়; দেবীর উভয় পার্শ্বে দুইটি দুইটি উলঙ্গ স্ত্রীলোক বাণনিক্ষেপ করিতেছে। বজ্রবারাহীর অপর নাম মরীচি। পাঁচফুট দীর্ঘ ও দুই ফুট প্রস্থ একখণ্ড প্রস্তরে প্রাচীনতম কালের একটি স্তূপ অঙ্কিত আছে। কানিংহাম ভারতস্তূপের রেলিংএর যেরূপ স্তূপচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্তূপটি তাহার অনুরূপ। পার্শ্বে আকাশে গন্ধর্ব্বগণ ও ভূতলে হস্তিগণ স্তূপের উপরে মাল্য নিক্ষেপ করিতেছে। ফণাত্রয়যুক্ত নাগগণ স্তূপটি বেষ্টন করিয়া আছে। কতকগুলি আট ফুট উচ্চ অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি আছে। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মস্তকে ধ্যানিবুদ্ধ অমিতাভের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তূপ, স্তম্ভ ও মূর্ত্তি মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে।

হিউয়েন্-থ্-সংবর্ণিত স্থানসমূহের মধ্যে কোন্‌গুলি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। এই চতুর্দ্দশ শত বৎসরের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার বর্ণিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, নিম্নলিখিত স্থানগুলি প্রধান ছিল।

১। মহারাজ অশোকস্তম্ভ

২। সঙ্ঘারাম

৩। মহারাজ অশোককর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রস্তরস্তূপ

৪। মৃগদাব-সঙ্ঘারাম হইতে দুই বা তিন লি দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩০০ শত ফুট উচ্চ স্তূপ। ইহার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থটি ব্যতীত কানিংহাম আর কোনটিরই স্থান-নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। প্রথমটি পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয়টির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা অদ্যাপি ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। হিউয়েন্-থ্-সংএর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে যে স্থলে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন, সেই সেই স্থলে মহারাজ অশোকের স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল।

কিন্তু ফা-হিয়ান্ বলেন যে, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন-স্থলে নির্ম্মিত হইয়াছিল, হিউয়েন্-থ্-সংএর এ স্থলের বর্ণনা অস্পষ্ট। সঙ্ঘারাম, বহুস্তূপ ও মন্দির বর্ণনার পর অশোকস্তম্ভের উল্লেখ করিয়া তিনি স্বতন্ত্রভাবে বলিয়াছেন যে "এই স্থলে প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন হইয়াছিল।" * Dr. Vogelএর এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া, অশোকস্তম্ভের অবস্থিতি স্থলকে প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। † ইহা সম্ভবপর; কারণ অশোক বুদ্ধের জন্ম ও মৃত্যুস্থলে এইরূপ এক একটি স্তম্ভ স্থাপন করাইয়াছিলেন। ইহা হিউয়েন্-থ্-সংএর বর্ণনা হইতে জানা যায়। কানিংহাম ধামেক স্তূপটিকে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থল বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

---

* Dr Vogel's Annual Report, p. 47

† Dr Vogel's Report, p. 47

খননকালে প্রাপ্ত খোদিত প্রস্তরসমূহ এবং অশোকস্তম্ভের গর্ভে প্রাপ্ত উপর্য্যুপরি স্থাপিত প্রাঙ্গণসমূহ হইতে বারাণসীতে বৌদ্ধপ্রাধান্যের ইতিহাসের কিয়দংশ উদ্ধার করা যায়। জগৎ-সিংহের স্তূপে প্রাপ্ত (কানিংহাম মহাবোধি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ইহা চৌখণ্ডি স্তূপে পাওয়া যায়; কিন্তু তিনি এই খোদিত লিপিযুক্ত বুদ্ধমূর্ত্তিটি জগৎসিংহের স্তূপে প্রাপ্ত লিখিয়াছেন) গৌড়াধিপ মহীপালের খোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজত্বকালে একটি স্তূপের জীর্ণসংস্কার হয়। কানিংহাম্ ধামেক স্তূপ খননকালে দেখিয়াছিলেন যে,স্তূপের ভিত্তি চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল-ভূমি হইতেও দশ ফুট নিম্নে আরব্ধ হইয়াছে এবং এই স্তূপের নিম্নার্দ্ধ প্রস্তরনির্ম্মিত ও অপরার্দ্ধ ইষ্টকনির্ম্মিত। স্তূপের গাত্রে খোদিত কারুকার্য্য দুই স্থলে বিভিন্ন প্রকারের। এই প্রমাণ হইতে তিনি যথার্থ অনুমান করেন যে, এই স্তূপটি অতি প্রাচীন ভিত্তির উপরে নির্ম্মিত। স্তূপের গাত্রের খোদিত কারুকার্য্য মধ্যে মধ্যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, স্তূপের জীর্ণোদ্ধার-কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। সারনাথ চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতে ৩০—৪০ ফুট উচ্চ। প্রায় দুই বর্গমাইল সারনাথ নামে পরিচিত। ইহার উচ্চতার কারণ এই যে, প্রাচীনকাল হইতে এই স্থলে স্তূপ ও বিহার এবং সঙ্ঘারাম প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে। কালে এ সমুদয় ধ্বংস হইলে তাহার উপরে পুনরায় গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপে সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সারনাথ ক্রমশঃ

উচ্চতা লাভ করিয়াছে। ধামেক স্তূপের বৃহদাকার প্রাচীনতা-পরিচায়ক ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তি (২৮ ফুট) ও উহার উপরের ৩৩ ফুট প্রস্তর-নির্ম্মিতাংশ (ইহার মধ্যে দশ ফুট ভূগর্ভে প্রোথিত) সম্ভবতঃ অশোকের সময়ে ইহার উপরের দশ ফুট প্রস্তর বহুকাল পরে যোজিত হইয়াছিল, কারণ নিম্নের প্রস্তরগুলি পরস্পরের গাত্রে লৌহশলাকা দ্বারা যুক্ত। উপরের দশ ফুট এরূপ নহে। সম্ভবতঃ ইহা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে নির্ম্মিত। হিউয়েন্‌-থ্‌-সং বারাণসীতে অশোকরাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রস্তরস্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ইহার ভিত্তি ভূগর্ভমগ্ন হইলেও ১০০ শত ফুট উচ্চ ছিল, জানা যায়। সম্ভবতঃ এই সময়ে সমগ্র স্তূপটী প্রস্তরনির্ম্মিত ছিল। কারণ ইষ্টকনির্ম্মিতাংশ তৎকালে বর্ত্তমান থাকিলে হিউয়েন-থ্‌-সং কখনই তাহা উল্লেখ করিতে ভুলিতেন না। ইহাও অনুমান হইতে পারে যে, হয় ত এই ইষ্টকনির্ম্মিতাংশ প্রস্তর দ্বারা আবৃত ছিল; কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, স্তূপের চারিদিকে প্রস্তর ঠিক একই স্থলে শেষ হইয়াছে এবং ইষ্টক প্রস্তরের প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছে অর্থাৎ তাহার উপর অন্য প্রস্তর রাখিবার উপায় নাই। এই ইষ্টকনির্ম্মিতাংশ মহীপালের সময়ে স্থিরপাল ও তাঁহার অনুজ বসন্তপাল কর্ত্তৃক যোজিত হয়। কানিংহাম এই ইষ্টকনির্ম্মিত অংশে যে খোদিতলিপি প্রাপ্ত হ'ন, তাহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত। সম্ভবতঃ ইহা হর্ষবর্দ্ধনকৃত জীর্ণোদ্ধারের সম-সাময়িক। অশোকস্তম্ভের গর্ত্তের প্রাঙ্গণগুলি দেখিলে পূর্ব্বোক্ত

অনুমান সত্য বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান মন্দির-প্রাঙ্গণের দশ ফুট নিম্নে চুনারের চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ আবিষ্কৃত হয়। ইহার নিম্নে স্তম্ভের প্রস্তর মার্জ্জিত নহে। অশোকস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বস্থ রেলিং এই প্রাঙ্গণের উপরে স্থাপিত। সুতরাং ইহাই নিশ্চিত যে, ইহাই অশোকনির্ম্মিত বিহার * বা মন্দিরের প্রাঙ্গণ। ইহার পাঁচ ফুট ঊর্দ্ধে মথুরার রক্তবর্ণ প্রস্তরের প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ সম্ভবতঃ কনিষ্কের সময়ে নির্ম্মিত। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত বোধিসত্বমূর্ত্তি, স্তম্ভ ও ছত্র এবং বহুসংখ্যক মূর্ত্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এই প্রস্তরনির্ম্মিত। মন্দিরের উত্তরের সঙ্ঘারামের বুদ্ধমূর্ত্তিটিও এই প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার তিন ফুট উপরে পুনরায় চুনারের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ দেখা যায়; ইহা অসমান এক প্রস্তরখণ্ড-নির্ম্মিত। অশোক হইতে কনিষ্কের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের চরমোৎকর্ষের সময়; এই নিমিত্ত এই উভয় প্রাঙ্গণের ব্যবধান কনিষ্ক ও হর্ষবর্দ্ধনের প্রাঙ্গণের ব্যবধান অপেক্ষা অধিক; কারণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতির সময়ে স্তূপ প্রভৃতি অধিক সংখ্যায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুষাণবংশীয় সম্রাট্‌গণের অধঃপতন ও

---

* ভারত স্তূপের রেলিংএ ঐ মন্দিরের চিত্র খোদিত আছে। এই প্রস্তরখণ্ড এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে—ইহাতে খোদিতলিপি আছে যথা="ভগবতো ধমচকং" Cunningham's Stupa of Bharhut plate XIII. and p. 110.

প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের অভ্যুদয়ের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হয়; সুতরাং এই সময়ে বৌদ্ধবিহার ও স্তূপ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই হেতু কনিষ্ক ও হর্ষের প্রাঙ্গণের ব্যবধান অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার দুই ফুট উচ্চেই বর্ত্তমান মন্দিরের প্রাঙ্গণ। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ দশায় সম্ভবতঃ অতি অল্পসংখ্যক স্তূপই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত এই দুই প্রাঙ্গণের ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। পরে নবাবিষ্কৃত মন্দিরে দেখা যায় যে, চুনারের ও মথুরার উভয় স্থলের প্রস্তরই মন্দিরনির্ম্মাণকালে ইষ্টকের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, অশোক চুনারের প্রস্তরে তাহার নির্ম্মিত স্তূপ ও বিহারাদি নির্ম্মাণ করান। কনিষ্ক বহু অর্থব্যয়ে মথুরা হইতে আনীত প্রস্তরে তাঁহার সময়ের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করেন। হর্ষবর্দ্ধন চুনারের প্রস্তর পুনরায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে পালরাজগণ ক্ষুদ্র উপলখণ্ড, চূণ ও সুরকীর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করান।

মহীপালের পূর্ব্বোক্ত খোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে, আটটি মহাস্থানের (অর্থাৎ পবিত্র স্থানের) ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া একটি নূতন গন্ধকুটী নির্ম্মিত হয়। নবাবিষ্কৃত মন্দিরের ভিত্তি সম্ভবতঃ এই গন্ধকুটির ভিত্তি। কপিশা হইতে মহিসুর পর্য্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর অশোক অজস্র অর্থব্যয়ে তাঁহার নির্ম্মিত সমুদয় বিহার ও স্তম্ভাদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন।

তাঁহার স্তম্ভ দর্পণের ন্যায় মসৃণ। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নৃপতি ও অসভ্য জাতি হইতে উৎপন্ন কনিষ্কের নির্ম্মিত ও স্থাপিত দ্রব্যাদি রক্তবর্ণ বহুব্যয়সাধ্য প্রস্তরে নির্ম্মিত, কিন্তু তথাপি দৃষ্টিরঞ্জক নহে। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন তাহার নির্ম্মাণের ব্যয় আরও সংক্ষেপ করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে প্রাদেশিক অধিপতি মহীপাল সুদূর চুনার কিংবা দূরতর মথুরা হইতে আনীত প্রস্তর ব্যবহার করিতে সমর্থ হ'ন নাই। তিনি অনায়াসলব্ধ ভগ্নাবশেষ মধ্যে প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ড ও সুলভ ইষ্টকে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সমূহের মধ্য হইতে এইরূপে ভারতের লুপ্ত ইতিহাসের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতে পারে। খননকালে কারুকার্য্য-যুক্ত বহু ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি গান্ধারে প্রাপ্ত গ্রীসদেশীয় স্তম্ভশীর্ষের ন্যায়। এতদ্ব্যতীত খননকালে কয়েকটি যক্ষ ও তারার মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে অশোকস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে ও চৌখণ্ডি নামক স্তূপের মধ্য-ভাগে খননকার্য্য চলিতেছে। পূর্ব্বের খননে চৌখণ্ডির চতুষ্পার্শ্বে বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত যে ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা চতুষ্কোণ। কানিংহাম বহুপূর্ব্বে এইটিকে হিউয়েন্-থ্-সং-বর্ণিত মৃগদাব হইতে ২—৩ লি দূরে অবস্থিত ৩০৪ শত ফুট উচ্চ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। চৌখণ্ডি ধামেক হইতে অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা দেখিলে স্পষ্টই উপ-লব্ধি হয় যে, কানিংহামের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। হিউয়েন্-থ্-সং-বর্ণিত

সঙ্ঘারামের কোন চিহ্ন এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই ; তাহার কারণ এই যে খনন অতি অল্প স্থলেই হইয়াছে। উক্ত সঙ্ঘারাম প্রস্তর-নির্ম্মিত অশোকস্তূপের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে স্থিরপাল ও বসন্তপাল কর্তৃক ও পরে জগৎসিংহ কর্ত্তৃক বহু ধ্বংসাবশেষ নষ্ট হইয়াছে। খননে যে মন্দিরটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা সম্ভবতঃ পালরাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, এই মন্দিরের ভিত্তি অতি প্রাচীন। হিউয়েন্-থ্-সং সঙ্ঘারামের মধ্যে অবস্থিত একটি ২০০ শত ফুট উচ্চ বিহারের বর্ণনা করিয়াছেন, এই বিহারের ভিত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত ছিল। বর্ত্তমান মন্দিরের পূর্ব্বদিকের ভিত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত। হিউয়েন্-থ্-সংএর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বারাণসীর বিহার বা মন্দির বুদ্ধগয়ার বিহার অপেক্ষা অধিক উচ্চ ছিল। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের এক পার্শ্ব ৫০ ফুট, কিন্তু সারনাথ বা বারাণসী মন্দিরের একপার্শ্ব ৯৫ ফুট; সুতরাং হিউয়েন্-থ্-সং-বর্ণিত ভিত্তির উপরে যে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সম্ভবপর। খননের ফল সংক্ষেপে এইরূপে বলা যাইতে পারে।

১। প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থান ও হিউয়েন্-থ্-সং-বর্ণিত অশোকস্তম্ভের আবিষ্কার। অশোকের নূতন স্তম্ভলিপি আবিষ্কার।

২। বুদ্ধের ভ্রমণস্থান আবিষ্কার ও কনিষ্কের শিলালিপিযুক্ত স্তম্ভ, ছত্র ও বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি আবিষ্কার।

৩। হিউয়েন্-থ্-সং-বর্ণিত ২০০ ফুট উচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত

ভিত্তির উপরে স্থাপিত ইষ্টকনির্ম্মিত বিহার বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার।

৪। মন্দিরের উত্তরে একটী কুষণ রাজত্বকালে সঙ্ঘারামের ভিত্তি আবিষ্কার।

হিউয়েন্-থ্-সং-বর্ণিত অন্য স্থানগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বরণানদীর উত্তরপূর্ব্বে অশোকরাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে স্তূপ ও স্তম্ভ ছিল,তাহা এক্ষণে ভৈরোঁলাট নামে পরিচিত। স্তূপটির কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু এই স্থলে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। স্তম্ভটি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দু মুসলমান বিদ্রোহে নষ্ট হয়। স্তম্ভের নিম্নের দুই তিন ফুট মাত্র অবশিষ্ট আছে, এতদ্ব্যতীত অপর সমুদয় অংশ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়। * হিউয়েন্-থ্-সং-বর্ণিত তিনটি পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সম্ভবতঃ হিউয়েন্-থ্-সংএর পরে অর্থাৎ পালরাজগণের সময়ে এগুলির আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। কারণ এগুলি এক্ষণে অত্যন্ত বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। বুদ্ধদেব যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বস্ত্র শুষ্ক করিতেন, হিউয়েন্-থ্-সং তাহার উপরে বস্ত্রের চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। এই প্রস্তর কানিংহাম বরাহীপুর গ্রামের নিকটে দেখিয়াছিলেন। † ইহা

---

* See M. A. Sherring's Sacred City of the Hindus, p. 191,

† Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. I, page 123 and plate XYXII.

এক্ষণে আর দেখা যায় না। কানিংহামের মানচিত্রে এই তিনটি পুষ্করিণীর নাম চন্দ্রোকর বা চন্দ্রতাল, নরোকর বা সারঙ্গতাল ও নয়াতাল পাওয়া যায়। এই নয়াতালের তীরে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর-খানি কানিংহাম দেখিয়াছিলেন। সারঙ্গতালের তীরে একটী ঢিপির উপরে একটী ক্ষুদ্রমন্দিরে সারনাথ নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রতিবৎসরে এই স্থলে একটী মেলা হইয়া থাকে। ইহা সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন স্তূপ-ভিত্তির উপরে নির্ম্মিত। হিউয়েন্-থ্-সং এই স্থলে একটী স্তূপের কথা উল্লেখ করেন। বুদ্ধ পূর্ব্বজন্মে এই স্থলে ছদন্ত হস্তীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এক ব্যাধ দন্তলোভে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে হস্তীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল; কিন্তু হস্তী সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদের সম্মানের জন্য ছয়টি দন্ত ভাঙ্গিয়া ব্যাধকে অর্পণ করিল। এই ঘটনার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ এই স্থলে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সারনাথ মন্দির এই স্তূপের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্ম্মিত, কারণ পুষ্করিণীতীর হইতে এই স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। সারনাথ ও চৌখণ্ডির মধ্যস্থ স্থান অদ্যাপি মৃগযূথের আবাস! ইহা কাশীর মহারাজের একটী রমনা বা শিকারের স্থান। পূর্ব্বোক্ত ছদন্তহস্তীর উপাখ্যানের চিত্র কানিং-হাম কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ভারতস্তূপের রেলিংএর একটী স্তম্ভে খোদিত আছে। ‡ এই প্রস্তরখণ্ড এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে।

‡ Cunningham's Stupa of Bharhut, plate XXVI and p. 62.

দশদিন

পাঠক-পঠিকাগণকে সারনাথের ইতিহাস-সাগর পার করাই-লাম। সারনাথের ইতিহাস ভারতের একটী স্মরণীয় ও বরণীয় সময়ের ইতিহাস। এ ইতিহাস সকলেরই বিশেষভাবে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। আমি নিজে ঐতিহাসিক নহি, অথচ সারনাথের বিবরণ না দিলে ঐ তীর্থস্থানের—ঐ বৌদ্ধ-বারাণসীর কোন কথাই বলা হয় না। তাই আমি শ্রীমান রাখালদাসের প্রবন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমার আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। সারনাথের এই অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়া ঐ স্থানের বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য যদি একজন পাঠকেরও আগ্রহ হয়, তাহা হইলেই আমার চেষ্টা সফল হইবে।

ইতিহাস ত বলা হইল, এখন আমার কথা একটু বলি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা চারিজন সারনাথে গমন করিয়াছি-লাম। ঘোড়ার গাড়ীতে এতখানি পথ যাইয়া শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র দাদা একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে মিউজিয়ম গৃহে লইয়া গেলাম। তিনি সেইখানে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার আর ঘুরিয়া দেখিবার সামর্থ্য রহিল না।

তাঁহাকে সেই স্থানে বসাইয়া রাখিয়া আমরা প্রথমেই মিউ-জিয়ম দেখা স্থির করিলাম, কারণ উক্ত গৃহ পাঁচটার সময়েই বন্ধ হইয়া যায়। এ মিউজিয়মে সারনাথের সমস্ত দ্রব্যই রক্ষিত হইয়াছে। এই গৃহে কি কি আছে, তাহার তালিকা দেওয়া

এ স্থলে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সারনাথের ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া যেখানে যাহা পাওয়া গিয়াছে, সে সমস্তই এখানে অতি যত্নে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

আমরা প্রথমে মূর্ত্তিগুলিই দেখিতে আরম্ভ করিলাম। বুদ্ধের মূর্ত্তিই যে কত রকম দেখিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। কিন্তু অনেকগুলি মূর্ত্তিই অক্ষতশরীরে বর্ত্তমান নাই। যাঁহারা এই মূর্ত্তিগুলিকে এমন করিয়া নষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর বিজাতীয় রাগ হইতে লাগিল। পুরাকীর্ত্তি কি এমন করিয়া নষ্ট করিতে হয়? এই সারনাথের কীর্ত্তিগুলি যদি যথাযথভাবে রক্ষিত হইত, তাহা হইলে কত গৌরবের জিনিসই দেখিতে পাওয়া যাইত। এখনই যাহা দেখিলাম, তাহাতেই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

মূর্ত্তিগুলি দেখা হইয়া গেল। আমাদের মত নিরক্ষর লোকে যেমন করিয়া দেখে, সেই রকমেই দেখা হইয়া গেল; কিন্তু যাঁহারা বৌদ্ধ-ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, যাঁহারা বৌদ্ধ-সময়ের কথায় অভিনিবিষ্ট, যাঁহারা দেখিতে জানেন, তাঁহারা ত কত-দিন ধরিয়া এই মূর্ত্তিগুলিই দেখিয়া থাকেন। আমরা যেমন করিয়া এতকাল যাদুঘর দেখিয়া আসিতেছি, তেমনই করিয়া দেখিলাম। আমার মনে পড়ে, কলিকাতার গড়ের মাঠে অনেক দিন পূর্ব্বে যে আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী হইয়াছিল, আমি তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন আমি বালক নহি—যুবক। আমি

দুই দিনেই সমস্ত প্রদর্শনীটা দেখিয়া ফেলিয়াছিলাম—দুই দিন অর্থাৎ তিনঘণ্টা করিয়া দুইদিন। দ্বিতীয় দিনে যখন প্রদর্শনী হইতে বাহির হইব, তখন একটী আমেরিকান সাহেবের সহিত যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা আমার এখনও বেশ মনে আছে। আমি বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছি দেখিয়া সাহেবটী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন (অবশ্য ইংরাজীতে) "বাবু, আপনার এক্‌-জিবিসন দেখা শেষ হইয়া গেল?" আমি বলিলাম "ধন্যবাদ, আমি দেখা শেষ করিয়াছি।" সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কয়দিনে দেখা শেষ করিলেন?" আমি বলিলাম "কাল ঘণ্টা তিনেক দেখিয়াছি, আর আজ ঘণ্টা দুই দেখিলাম। ইহাতেই আমার সব দেখাশুনা হইয়া গিয়াছে।" সাহেব গভীর বিস্ময়ের সহিত আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন "বাবু, আমাকে ক্ষমা করিবেন; আপনি দুই দিনে খুব বেশী হয় ত ছয় ঘণ্টায় কেমন করিয়া এত বড় প্রদর্শনীটা দেখা শেষ করিলেন, তাহাই আমি ভাবিতেছি। আমি এই প্রদর্শনী দেখিবার জন্য আমেরিকা হইতে আসিয়াছি। আমি আজ তের দিন দেখিতেছি—প্রত্যহ দশটার সময় আসি, আর যতক্ষণ খোলা থাকে, ততক্ষণ দেখি। আমার যে এখনও এই প্রদর্শনীর তৃতীয়াংশও ভাল করিয়া দেখা হইল না।" সেই কথাই এখন মনে পড়িয়াছে। সারনাথের এই মিউজিয়মের মূর্ত্তিগুলি আমি ত দশমিনিটের মধ্যেই দেখা শেষ করিলাম; কিন্তু তেমন দর্শক

হইলে দশদিনেও দেখা শেষ করিতে পারেন কি' না সন্দেহ। সুতরাং আপনারা জানিয়া রাখুন যে, আমাদের এই সকল প্রদর্শনী-দর্শনের মূল্য কত? এ যেন বিদেশী-ভ্রমণকারীদিগের পনরদিনে ভারত-ভ্রমণের ন্যায়।

থাকুক সে কথা। যখন মূর্ত্তি-দর্শন শেষ হইল, তখন ভাঙ্গা ইট-পাথর দেখিতে গেলাম। এগুলিও অতি যত্নে মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। এগুলি যে কত সুন্দর, তাহা বলিতে পারি না। কি অপূর্ব্ব চিত্রকৌশল এক-একখানি ইটের উপর, এক-একখানি পাথরের উপর প্রদর্শিত হইয়াছে। দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। মনে একটা স্পর্দ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল। অতীতের এই শ্মশান-স্তূপের মধ্যে দাঁড়াইয়া মাথাটা যেন আপনা হইতেই উঁচু করিতে ইচ্ছা হইল। কাহারা এই সকল স্থপতি? তাঁহারা ত বিদেশ হইতে আসেন নাই;—তাঁহারা যে আমাদেরই লোক—তাঁহারা যে আমাদেরই পূজনীয় পিতৃপুরুষ—তাঁহারা যে হিন্দু! বৌদ্ধ-বারাণসী নির্ম্মাণকার্য্য যাঁহারা সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু বই কি! বৌদ্ধধর্ম্মকে আমি ত কোন দিনই পৃথক একটা কিছু বলিয়া মনে করিতে পারি নাই;—আমি ত ভাবিয়া রাখিয়াছি, স্থির করিয়া রাখিয়াছি, আমরাই হিন্দু, আমরাই বৌদ্ধ। হিন্দু ও বৌদ্ধে ভিন্নভাব কোন দিন আমার মনে হয় নাই। তাই এই বৌদ্ধ-বারাণসীর স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া—এই মিউ-জিয়মে দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে, গর্ব্বে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ

হইয়াছিল; আমি অবাক্ হইয়া এই ভগ্ন ইষ্টক-প্রস্তরখণ্ড সকল দেখিয়াছিলাম।

যে কক্ষে এই সকল ইষ্টক-প্রস্তর আছে, সেই গৃহের মধ্যে আর একজন যাত্রীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আর কেহ নহেন—সিবিলিয়ান-প্রবর লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়। তিনি কাশীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন,—আজ সারনাথ দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। জননী গাড়ীতে বসিয়া আছেন, লোকেন্দ্রনাথ মিউজিয়ম দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে ভাল সঙ্গীই মিলিল। তিনি বিশেষভাবে অনেকগুলি প্রস্তরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন; সুতরাং দেখাটা ভালই হইল। তাহার পর তিনি, যে কক্ষে মূর্ত্তিগুলি ছিল, সেই দিকে গেলেন; আমরা মিউজিয়মের অপর পার্শ্বের একটী কক্ষে গেলাম। এই স্থানে সেই সুদূর অতীতের গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি রক্ষিত হইয়াছে। সারনাথের স্তূপ-খননকালে অনেকগুলি গৃহ হইতে এই সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে! মাটীর কলসী, হাঁড়ি, সরা, রেকাবী প্রভৃতি কত কি দেখিলাম;—কত জিনিস, কত আসবাবপত্র দেখিলাম;—ঘটী বাটি কত দেখিলাম; আরও কত কি যে দেখিলাম, তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। সঙ্গী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র দাদা মহাশয় বলিলেন যে, পূর্ব্বে তিনি যখন দেখিতে আসিয়াছিলেন, তখন কতকগুলি সেকেলে চাউল দেখিয়াছিলেন।

তেতো বাঙ্গালী আমরা সেই চাউল দেখিবার জন্য সমস্ত স্থান খুঁজিলাম; কিন্তু চির-অন্নহীনের অদৃষ্টে চাউলের দর্শনলাভ হইল না। চারুদাদা বলিলেন, যাঁহারা পূর্ব্বে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা হয় ত প্রহরীদিগের অজ্ঞাতসারে দুই চারিটী করিয়া লইয়া গিয়াছেন; তাই সেগুলি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

মিউজিয়ম দেখা শেষ হইল; আমরা, যেখানে দেবেন্দ্র দাদাকে বসাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম, সেই স্থানে গেলাম। দেখি সেখানে দেবেন্দ্র দাদা পালিত মহাশয়ের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছেন। তাঁহাদের পার্শ্বের টেবিলের উপর একখানি পরিদর্শন-পুস্তক রহিয়াছে। একজন কর্ম্মচারী আসিয়া পালিত মহাশয়কে সেই পরিদর্শন-পুস্তকে কিছু লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পালিত মহাশয় তাহাতে নিজের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া, আমাকেও কিছু লিখিতে বলিলেন। তাঁহার অনুরোধে আমিও লিখিতে বসিলাম; কিন্তু বাঙ্গালায় লিখিব কি ইংরাজীতে লিখিব, এই কথাই ভাবিতে লাগিলাম। তীক্ষ্নবুদ্ধি দেবেন্দ্র দাদা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "ভায়া, ভাবুছেন কি? ইংরাজীতেই লিখুন। সেই ভাল।" পালিত মহাশয়ও সেই রায়েই রায় দিলেন। একজন অবসর-প্রাপ্ত সিবিলিয়ান—প্রকাণ্ড হাকিম; আর একজন তখনও হাকিম;—একজন সবজজ্, আর একজন তাঁর উপরওয়ালা জজ্ সাহেব। এই দুই হাকিমের রায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করা আমার মত ক্ষুদ্র বাঙ্গালীর পক্ষে

সম্ভবপর হইল না,—যদিও বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আমি আমার মাতৃভাষাকে তুচ্ছ করিয়া ইংরাজী ভাষায় আমার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিব না ;—আমার ভাষাজননী কি এতই ছোট যে, তিনি পরিদর্শন-পুস্তকে স্থানপ্রাপ্ত হইতে পারেন না ? কিন্তু কি করিব, হাকিমের উপর হুকুম চলে না। আমি ইংরাজী ভাষাতেই আমার মন্তব্য লিখিলাম। লোকেন্দ্রনাথ পালিতের মন্তব্যের নীচেই আমার মন্তব্যের স্থান হইল। হায়! এ মরজগতে আর লোকেন্দ্রনাথের সহিত এক আসনে বসিতে পাইব না। কে জানিত যে, সারনাথের শ্মশানেই তাঁহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ হইবে! কে জানিত যে জীবনব্যাপী সাহেবী-চালচলন-পরায়ণ লোকেন্দ্রনাথ—অষ্ঠেপৃষ্ঠে-ললাটে সাহেবী ছাপমারা লোকেন্দ্রনাথ, সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া মরিবার জন্যই কাশীতে আগমন করিয়াছিলেন। যে কাশীতে দেহত্যাগ করিবার জন্য কত-জন লালায়িত—মরিবার জন্য কতজন সুদীর্ঘ কত কাল বারাণসীতে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন, কত কষ্ট সহ্য করিতেছেন,—লোকেন্দ্রনাথ সপ্তাহের জন্য বেড়াইতে আসিয়া সেই কাশীতেই দেহত্যাগ করিলেন। আমাদের সহিত তাঁহার যে দিন সারনাথে দেখা হইয়াছিল, সে দিন তিনি বলিয়াছিলেন যে, দুইতিনদিন পরেই তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে কাশীতে রাখিয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া যাইবেন। কিন্তু আর যাওয়া হইল না—বিশ্বনাথ তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। কাশী ত্যাগ করিয়া আমরা যে দিন

কলিকাতায় পৌঁছিলাম, তাহার পরদিনই সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, লোকেন্দ্রনাথ পালিত পূর্ব্ব রাত্রিতে কাশীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কোন পীড়া হয় নাই; সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে। জননীকে কাশীতে রাখিয়া তিনি দেশে আসিবেন,—তাহা না হইয়া তাঁহাকে বাবা বিশ্বনাথের চরণে সমর্পণ করিয়া বৃদ্ধা জননী গভীর পুত্রশোক বুকে করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। লোকেন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া আমার একটী প্রবচনই বারবার মনে হইয়াছিল—"জীবন কাটুক যেমন-তেমন মরতে জান্‌লে হয়।"

মিউজিয়ম হইতে বাহির হইয়া আমরা, যে স্থান খনন করা হইয়াছে, সেই স্থান দর্শন করিতে গেলাম। দেবেন্দ্র দাদা এখনও আমাদের সঙ্গী হইলেন না; তিনি মিউজিয়মেই বসিয়া থাকিলেন। আমরা প্রথমে খনন স্থানে না গিয়া 'ধামেক স্তূপ' দেখিতে গেলাম। সে এক বিশাল স্তূপ,—এখনও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া সেই অতীত যুগের মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমরা এই স্তূপটী তিন চারিবার প্রদক্ষিণ করিলাম। ইহার আর বর্ণনা কি দিব! ইহা বর্ণনার দ্রব্য নহে—দেখিবার দ্রব্য! এই স্থানে, লোকেন্দ্র পালিত মহাশয়ের বৃদ্ধা মাতার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। শুনিলাম তিনি অনেকক্ষণ এই স্থানে ভ্রমণ করিয়া এক্ষণে এই স্তূপের পার্শ্বে বিশ্রাম করিতেছেন। আমরা তখন সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নামিয়া পড়িলাম। অতি অল্প খানিকটা

স্থানই খনিত হইয়াছে। ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় এখন খনন-কার্য্য বন্ধ রহিয়াছে। আমার ত মনে হইল সারনাথের অতি সামান্য অংশই খনন করা হইয়াছে; চারিদিকে আরও অনেক ভূমিখণ্ড সারনাথের ঐশ্বর্য্য যক্ষের ধনের মত লুকাইয়া রাখিয়াছে। আরও খনিত হইলে কত অমূল্য সম্পদ যে বাহির হইবে, তাহা বলা যায় না। শুনিলাম, গবর্ণমেণ্ট হইতে এই খননকার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এ অঞ্চলের অনেকে এই স্থান হইতে অনেক দ্রব্য-সম্ভার লইয়া গিয়াছেন। এখন কিন্তু এ স্থান হইতে এক টুকুরা পাথরও কাহারও লইয়া যাইবার হুকুম নাই; স্থানে স্থানে এই মর্ম্মে ইস্তাহার দেওয়া রহিয়াছে। চারিদিকে ঘুরিয়া, গর্ত্তের মধ্যে নামিয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, ঐ সকল খনিত স্থান হইতে যাহা যাহা পাওয়া গিয়াছে, সে সকলই তুলিয়া লইয়া মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে; কেবল কয়েকটি অতি সুন্দর স্তম্ভ একটা গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া আছে। বোধ হয় চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোকের কমে তাহার একটী স্তম্ভকেও স্থানান্তরিত করা যায় না; সেই জন্যই সেগুলি ঐ স্থানেই পড়িয়া আছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়িল। তখন আমরা সারনাথের ধ্বংসাবশেষ দর্শন এক প্রকার শেষ করিয়া কাশীতে আসিবার জন্য বাহির হইলাম। গাড়ীর নিকট আসিয়া দেখি দেবেন্দ্র দাদা গাড়ীর মধ্যে বসিয়া আছেন। আমরা তখন গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। একটু আসিয়াই পথের দক্ষিণদিকে আর

একটা স্তূপ দেখিলাম। **ইহাই চৌখণ্ডী স্তূপ।** তাহার উপরে ছোট একটী ঘরের মত আছে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র দাদা বলিলেন যে, এই স্তূপে উঠিবার পথ আছে; তবে আমরা এখন এত হাঁটাহাঁটি করিয়া ক্লান্ত হইবার পর এতখানি চড়াই উঠিতে পারিব কি না সন্দেহ। তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য আমরা পথের পার্শ্বে গাড়ী থামাইয়া সেই স্তূপের উপর উঠিতে গেলাম। দেবেন্দ্র দাদা গাড়ীতে বসিয়া থাকিলেন। সঙ্গী দুইজন—চারু দাদা, ও শ্রীমান শৈলেন্দ্র ক্লান্ত হইলেন কি না বলিতে পারি না, আমার এই বৃদ্ধ বয়সেও কিন্তু ক্লান্তি-বোধ হইল না;—আমি সকলের আগে গিয়া স্তূপের উপর উঠিয়া বসিলাম। এই স্তূপের মধ্যে কি আছে, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের খননকারীরা ইহার গাত্রে একটা গভীর সুড়ঙ্গ খনন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে কিছুই পাওয়া যায় নাই—এই স্তূপ শূন্যগর্ভ নহে—একেবারে পূর্ণ।

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল দেখিয়া আমরা সেস্থান ত্যাগ করিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। আমাদের সারনাথ দর্শন শেষ হইল।

দশদিন

শঙ্করাচার্য্যের মঠ

'সারনাথ' হইতে ফিরিবার সময় গাড়ীতে বসিয়াই পরদিনের 'প্রোগ্রাম' স্থির করার কথা উঠিল। শ্রীযুক্ত বড়দাদা চারুবাবু বলিলেন, "এখন ত বাড়ী চল, তার পর যা হয় ঠিক করা যাইবে।" শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাল সারাদিন কাশী-ভ্রমণ, কোন বিশেষ স্থানে যাওয়া নয়।" আমার তাহাতে কোনই আপত্তি ছিল না; কারণ কাশীতে ইতঃপূর্ব্বে তিন চারিবার আসিলেও আমার সহর-ভ্রমণ হয় নাই;—আমি ত তখন আর সহর দেখিতে আসিতাম না। আমি তখন খেয়ালের বশে আসিতাম—খেয়ালের ঘোরে হয় ত একটা ঘাটে বসিয়া থাকিয়াই চলিয়া যাইতাম;—সহরময় ঘুরিয়া বেড়ান, কোথায় কি আছে তাহার অনুসন্ধান করা, প্রত্যেক ঠাকুরবাড়ী দর্শন করা,—এ সব কোন গোল আমার ছিল না। কাজেই কাশী সহরটা আমার তেমন করিয়া দেখা হয় নাই।—তবে এ কথাটা অস্বীকার করিতে পারিব না যে, কাশীর অনেক তথ্য, অনেক বিবরণ আমি পূর্ব্বের একবারে জানিয়া গিয়াছিলাম। সে অভিজ্ঞতা আমি—অপরের হিসাবে বড়ই অধিক মূল্যে—কিন্তু আমার হিসাবে অতি সামান্য মূল্যেই—সঞ্চয় করিয়াছিলাম,—আমি প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম। তখন সে জন্য চিন্তা ছিল না; কিন্তু এখন হইলে—থাক্ সে কথা।

আমার কাশী সম্বন্ধে পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার পরিচয় এ **দশদিনের** অন্তর্গত নহে,—সে কথা এখন থাকুক। যদি আর কখন সময় পাই, আমার '**অভাগী**'তে যে কথা বলিতে বসিয়াও বলি নাই, যদি কোন দিন সেই কথা বলি, তখন আমার কাশীর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিব; তখন দেখাইব, এই পুণ্যতীর্থকে আমরা—প্রধানতঃ বাঙ্গালী আমরা—কেমন কলুষকলঙ্কিত করিয়াছি—বাঙ্গালীটোলা নামটীকে কেমন দূষিত করিয়াছি; কিন্তু আজ দশদিনের কথা বলিতে বসিয়া সে কথা আর তুলিব না।

কাশীর বাঙ্গালীটোলার কথা আমি বলিতে পারি, কিন্তু কোন-বারই ত নগর ঘুরিয়া দেখি নাই; সুতরাং শৈলেন্দ্র বাবাজীর প্রস্তাব আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলাম। কিন্তু এই গাড়ীর দরবারের সভাপতি যে দেবেন্দ্র দাদা; তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিতে হইবে; আমাদের মতামত ত কার্য্যকরী হইবে না। দেবেন্দ্রদাদা বলিলেন, "সহর দেখা যখন-তখনই হইবে। আমি যাহা দেখাইবার, তাহা ত আগে দেখাই; তার পর যার যা দেখাইতে হয়, দেখাইও।" হাকিম মানুষ কি সহজে রায় দেন—বিশেষ দেওয়ানী হাকিম। তাঁহারা একটা মামলা বাইশ বার মুলতবী রাখিয়া শেষে ছয়মাস পরে বিচারের দিন ধার্য্য করেন, এবং বিচার শেষ করিতে—রায় প্রকাশ করিতে আরও ছয়মাস কাটাইয়া দেন। সুতরাং দেবেন্দ্র দাদা রায়টা

মুলতবী রাখিলেন। তবে এ ক্ষেত্রে ছয় মাস পরে দিন ফেলিবার উপায় ছিল না, কারণ আমার কাশীর পরমায়ু আর তিন দিন মাত্র। তাই তিনি বলিলেন "যাহা হয় রাত্রিতেই স্থির করা যাইবে।" তথাস্তু!

রাত্রিতে আহারের সময় তিনি বলিলেন যে, পরদিন খুব ভোরে শঙ্করাচার্য্যের মঠ দেখিতে যাওয়া হইবে। তাহাই স্থির হইল।

পরদিন খুব ভোরেই আমরা প্রস্তুত হইলাম। শঙ্করাচার্য্যের মঠ যে কতদূর, তাহা আমি জানিতাম না; সুতরাং একখানি গাড়ী ডাকিবার জন্য চাকরদিগকে বলিলাম। দেবেন্দ্র দাদার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "গাড়ী ডাকিতে হইবে না। বাবা না গেলে আমরা হাঁটিয়াই যাইতাম। বাবা যাচ্ছেন, তাই একখানি এক্কা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।" এ ছেলেটী বলে কি? এক্কা—একজনের সোয়ারী; আমরা যে তিনজন; আবার সেই তিনজনের মধ্যে একজন নিতান্তই দুর্ব্বলশরীর; —দেবেন্দ্র দাদা এক্কায় চড়িবেন কি করিয়া। শ্রীমান বলিলেন যে, তাঁহার পিতৃদেব প্রতিদিনই অপরাহ্নকালে এক্কায় চড়িয়া দুই-তিন মাইল বেড়াইয়া আসেন। ভাল কথা!

একটু পরেই দেবেন্দ্র দাদা, শ্রীমান রবীন্দ্র এবং আমি এক্কায় সওয়ার হইয়া শঙ্করাচার্য্যের মঠ দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

দশমদিন

আধমাইল পথ যাইয়াই আমাদের একা একটী অতি সংকীর্ণ গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। এই গলিটা যে মিউনিসিপালিটীর এলাকাভুক্ত, এ কথা কাশীর গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়াও চেয়ারম্যান বাহাদুর যদি বলেন, তাহা হইলেও আমি তাঁহার কথা বিশ্বাস করিব না—এমনই সে রাস্তার অবস্থা! সেই পথে অতি কষ্টে একটু অগ্রসর হইয়াই একাওয়ালা জবাব দিয়া বসিল যে, আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। আমরা তখন গাড়ী হইতে নামিলাম, এবং সেই গলি দিয়া আর একটু যাইয়াই জঙ্গলের মধ্যে একটা একপেয়ে পথে প্রবেশ করিলাম। একাওয়ালা যদি একেলা আমাকে লইয়া যাইত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বলিতাম যে, তাহার পথভ্রম হইয়াছে; কারণ কাশীতে শঙ্করাচার্য্যের মঠে যাইবার যে একটা ভাল পথ নাই; কাঁটাগাছ ঠেলিয়া, জঙ্গলের মধ্য দিয়া যে, শঙ্করমঠে যাইতে হয়, একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু সঙ্গে দুই জন রহিয়াছেন; তাঁহারা মঠের পথ চেনেন; তাঁহাদের ভ্রম হইতেই পারে না। কি করিব, সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম।

আঁকাবাঁকা পথ ও জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আমরা একটা পুরাতন অথচ একটু বড় বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দেবেন্দ্র দাদা বলিলেন—এইটীই শঙ্করাচার্য্যের মঠ।

এই শঙ্করাচার্য্যের মঠ! এই জঙ্গলের মধ্যে এই নির্জ্জন

স্থানে ভারতের ধর্ম্মবীর শঙ্করাচার্য্যের মঠ! যে শঙ্করাচার্য্যকে ভারতবর্ষের লোকে দেবাদিদেব শঙ্করের অবতার বলিয়া থাকেন, এই তাঁহার মঠ! এই জনসমারোহপূর্ণ বারাণসীর এক প্রান্তে, এই জঙ্গলের মধ্যে এই নির্জ্জন স্থানে শঙ্করাচার্য্যের মঠ রহিয়াছে! এখানে আসিবার ভাল একটা পথও নাই। এখানে কি তবে কোন যাত্রী আগমন করেন না?

আমরা মঠের দ্বারের নিকট গেলাম;—তখনও দ্বার বন্ধ,—একটী লোকও দেখিলাম না। আমরা দ্বারের সম্মুখে বসিয়া পড়িলাম;—দর্শন না করিয়া যাইব না। প্রায় পনর মিনিট পরে ভিতর হইতে একজন সন্ন্যাসী দ্বার খুলিয়া দিলেন। আমরা মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু কৈ, লোকজন কৈ? এত বড় প্রাঙ্গণ—একটী মানুষও নাই। মন্দিরের দ্বার তখনও অর্গলবদ্ধ। যে সন্ন্যাসী দ্বার খুলিয়া দিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মন্দির-দ্বার খুলিবার বিলম্ব নাই—তিনিই খুলিবেন। আমরা তখন মন্দিরের সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া রহিলাম; সন্ন্যাসী মহাশয় কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে তাঁহার শুভাগমন হইল। তিনি তখন মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিলেন। আমরা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম —মন্দিরমধ্যে উচ্চ আসনের উপর মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বসিয়া আছেন! কি সুন্দর মূর্ত্তি!

দেবমূর্ত্তি অনেক দেখিয়াছি—প্রসিদ্ধ ভাস্করগণের নির্ম্মিত অনেক

মূর্ত্তি দেখিয়াছি, কিন্তু এমন মূর্ত্তি দেখি নাই—কোথাও দেখি নাই। শঙ্করাচার্য্যকে প্রণাম করিব, কি যিনি এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই প্রণাম করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। আমার মনে হইল, যে-সে ভাস্কর এ মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন নাই; পয়সার লোভে বা শিল্পের ঔৎকর্ষ দেখাইবার জন্য ভাস্করপ্রবর এ কার্য্যে হস্তার্পণ করেন নাই। তাহা হইলে এমন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিত না। এ যে সাধকের হৃদয় দিয়া গঠিত মূর্ত্তি! এ মূর্ত্তির প্রত্যেক অংশ নির্ম্মাণ করিবার সময় ভাস্করকে সেই মহাত্মার স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইয়াছিল—শঙ্করের মূর্ত্তি এই ভাস্কর তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন। শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত এই শঙ্করদেবের বদনে যে ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিলে ভক্তিভরে হৃদয় অবনত হয়। প্রতিভা যেন সেই মুখ-চোখ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। গর্ব্ব, অহঙ্কার কিছুই সে মুখে নাই; সে সহাস্যবদন যেন পাপী-তাপীর আশ্রয়স্থল; সেই প্রশস্ত ললাট যেন অনন্যসাধারণ মনীষার লীলাভূমি! বড়ই সুন্দর এই মূর্ত্তি! একটু পূর্ব্বেই মনে যে একটা ক্ষোভের ভাব আসিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল; মনে হইল এই জঙ্গলই ভাল—এই নির্জ্জনতাই ভাল;—এই বাহ্যিক জাঁকজমক ও সমারোহের অভাব এই স্থানে সম্পূর্ণ শোভন হইয়াছে। নানা শ্রেণীর কৌতূহলপরায়ণ যাত্রী-দিগের কলরবে এই স্থান মুখর না হইয়া ভালই হইয়াছে।

দশদিন

পূর্ব্বে যে সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছি, তিনি প্রথমে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তিটীর গাত্রমার্জ্জনা করিলেন। তাহার পর একখানি সূক্ষ্ম গৈরিক-বস্ত্র আনিয়া সেই মূর্ত্তিটাকে পরাইয়া দিলেন; সন্ন্যাসীরা যে ভাবে বস্ত্র পরিধান করেন, মূর্ত্তিটাকে সেই ভাবেই বস্ত্র পরাইয়া দেওয়া হইল। বস্ত্র না পরাইলেই বেশ হইত। তাহার পর সন্ন্যাসী মহাশয় পূজায় বসিলেন; আমরাও বিদায়-গ্রহণ করিলাম। স্থানটী এমন নির্জ্জন এবং শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি এমন সুন্দর যে, সারাদিন সেখানে বসিয়া মূর্ত্তিটী দেখিলেও যেন দেখা শেষ হয় না। কিন্তু বেলা বাড়িয়া যাইতেছিল; দেবেন্দ্র দাদাও অসুস্থশরীর; সুতরাং আমরা সে বেলার মত এই মন্দির ত্যাগ করিলাম। পথে আসিতে-আসিতে স্থির করা গেল যে, সন্ধ্যার সময় আমরা পুনরায় এই মন্দিরে আসিয়া আরতি দর্শন করিব।

সারাদিন এদিক-ওদিক বেড়াইয়া সন্ধ্যার সময় আবার আমরা শঙ্করাচার্য্যের মঠে আরতি দর্শন করিতে গেলাম;—এবারও সঙ্গী দেবেন্দ্র দাদা। আমি মনে করিয়াছিলাম, প্রাতঃকালেই যেন লোকসমাগম হয় নাই, সন্ধ্যার আরতির সময় নিশ্চয়ই জনতা হইবে। কিন্তু তখনও যাত্রী নাই; তবে প্রাতঃকালে কেবল একজন সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলাম, এখন আরও চারিপাঁচজনকে দেখিলাম। নির্জ্জনতায় বেশ আনন্দ বোধ হইল বটে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের মঠ দর্শন করিবার জন্য ঐ সৌম্য

তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য এত বড় কাশীধামের মধ্যে কি কাহারও আগ্রহ হয় না? এ কেমন কথা, বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা আরতি দর্শন করিলাম। কাশীতে বিশ্বনাথের আরতি অনেকবার দর্শন করিয়াছি; কত তীর্থস্থানে কত দেবদেবীর আরতি দর্শন করিয়াছি; কিন্তু আমি দুই একটী স্থান ব্যতীত আর কোথাও আরতি দর্শন করিয়া এমন তৃপ্তি, এত পবিত্রতা অনুভব করি নাই। বিশেষ বাদ্যভাণ্ড ছিল না, কাড়া-দামামা বাজে নাই, দ্বারে নহবৎ সুস্বরলহরীতে সান্ধ্যগগন প্লাবিত করে নাই, অসংখ্য জনমণ্ডলীর, অগণ্য ভক্তের জয়ধ্বনি বা সাধুসন্তের স্তোত্রপাঠে মন্দিরপ্রাঙ্গণ মুখর হয় নাই;—তবু কি জানি কেন, একটা পবিত্রতার স্রোত যেন বহিয়া যাইতে লাগিল। বিশ্বনাথের আরতি অতি সুন্দর; কিন্তু সেখানে চিত্ত সংযত করা যায় না, আরতিদর্শনার্থী নরনারীর ঠেলাঠেলিতে একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইবার যো থাকে না। এখানে সে সব কিছুই নাই—দর্শনার্থী আমরা তিনটী মানুষ।

এই স্থানে দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতে-দেখিতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সেই মহতী বাণীই আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল—

পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্যচাসনং।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ॥

সদা যিনি পূর্ণ তাঁর কোথা আবাহন,
সর্ব্বাধার যিনি তাঁর কোথায় আসন,
পাদ্যঅর্ঘ্য কোথা তাঁর স্বচ্ছ যিনি হন ;
পবিত্র জনের কোথা আছে আঁচমন।

নির্লেপস্য কুতো গন্ধঃ পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ।
নির্গন্ধস্য কুতো ধূপঃ স্বপ্রকাশস্য দীপিকা ॥

নির্লেপে কি প্রয়োজন চন্দন লেপনে,
নির্ব্বাসনে কি হইবে কুসুম প্রদানে,
নির্গন্ধ জনের কিবা প্রয়োজন ধূপে,
জ্যোতির্ম্ময় যিনি তাঁর কিবা কাজ দীপে। *

আরতি শেষ হইয়া গেল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমরা ধীরে-ধীরে মন্দির ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম। মনে তখন নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল। ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করি নাই, বেদান্ত পাঠ করি নাই, কোন কাণ্ডেরই খোজ রাখি না ;—সংসারের কীট, সংসারের সেবা লইয়াই আছি। কিন্তু আজ এই আশ্রম, এই সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া মনে হইতে লাগিল, এমনই করিয়া কি দিন যাইবে ? সময় ত চলিয়া যাইতেছে। যাঁহার নিকট হইতে এইমাত্র চলিয়া আসিলাম, তিনি কতদিন

* এই শ্লোক দুইটীর পদ্যানুবাদ পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় করিয়া দিয়াছেন।

কতভাবে উপদেশ দিয়াছেন যে, এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর—কা তব কান্তা কস্তে পুত্র—এ সংসার মায়ার খেলা! সত্যই কি তাই? সত্যই কি এ সব মায়া—সব ছায়া;—সত্যই কি—

"এসেছি কি কাজে,—কিবা কাজে যায় দিন!
ভীষণ তরঙ্গরঙ্গে খেলে মহামায়া,
জীবকুল ভাসমান মহা অন্ধকারে,
ঘোরে ফেরে জন্মমৃত্যু ঘূর্ণিপাক মাঝে।
ভ্রম ব'লে রহে ভুলে কল্যাণ না চায়;
বারবার ঠেকে, পুনঃ পুনঃ দেখে,
শিখেও না শিখে হায়!"

কি কাজে এসেছি—কি কাজে দিন যায়! তুমি কি বলিতে চাও, পণ্ডিত, সব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণই পন্থা? ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই! আমিও একদিন এই কথা বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু তাই কি ঠিক? সংসার-ত্যাগই কি সন্ন্যাস? সন্ন্যাসের অর্থ কি প্রভু? তোমার এ অর্থ বুঝি না। সত্যমিথ্যা জানি না—শাস্ত্র কি বলে, বলিতে পারি না; কিন্তু আমার মনে হয়—এই সংসারই সন্ন্যাসের স্থান—এই পরিবারের মধ্যে থাকিয়াই সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয়;—তাহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের মন্দিরে আরতি দেখিতে-দেখিতে এই কথাই আমার মনে উঠিয়াছিল; বাহিরে আসিয়া এই কথাই ভাবিতে-ভাবিতে গৃহাভিমুখী হইয়াছিলাম। সঙ্গী দার্শনিক-

প্রবর দেবেন্দ্র দাদাকে একথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কাহাকেও কোন দিন এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। নিজের মনেই কথা তুলি, নিজেই তাহার মীমাংসা করি;—আর তাহার পর সেই মীমাংসার মত কাজ করিতে ভুলিয়া যাই। তীর্থ-দর্শনে আমাদের কি হইবে? মনকে প্রবোধ দিই—

"অত বোঝাপড়ায় কাজ নেই রে মন!
বোঝ সোজা চল সোজা।"

রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া সেই রাত্রিতে স্থির করিলাম যে, অসুস্থ দেবেন্দ্র দাদাকে পরদিন বিশ্রামলাভের অবকাশ দিতে হইবে। শ্রীমান রবীন্দ্রনাথকে বলিলাম "আগামী কল্য প্রাতঃ-কালে তোমাতে আমাতে মিলিয়া রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম দেখিতে যাইব।" রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃত হইল। সে বলিল "সত্যসত্যই কাশীতে একটী প্রধান দেখিবার স্থান এই সেবাশ্রম। সেখানে গেলে শরীর পবিত্র হয়।" বুঝিলাম, ছেলেটী পিতার উপযুক্ত পুত্র। এম,এ পাশ করিয়া সে আর দশজনের মত হয় নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা এই সর্ব্বপ্রধান তীর্থ-দর্শনের জন্য যাত্রা করিলাম। কেহ হয় ত বলিবেন "তুমি কেমন

লোক হে? কাশীতে এত দেবালয় থাকিতে—বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা থাকিতে তুমি বলিলে কি না, এই সেবাশ্রমই সর্ব্বপ্রধান পুণ্যতীর্থ।" হাঁ, তাহাই বলিলাম। সে দিনও বলিয়াছিলাম —আজিও বলিতেছি—কাশীতে সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান এই রাম-কৃষ্ণ-সেবাশ্রম। যে আশ্রমে আর্ত্তের সেবা হয়—রোগীর শুশ্রূষা হয়;—যেখানে নর-নারায়ণগণ দরিদ্র-নারায়ণগণের জন্য প্রাণ-পাত করেন, যেখানে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানের যিনি দেবতা, তিনি সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন;—যেখানে তাঁহার করুণাধারায় স্নাত হইয়া সেবকেরা আর্ত্তের সেবা করিয়া থাকেন, সেই স্থানই ত নারায়ণের মন্দির! সেই ত বিশ্বনাথের প্রিয় স্থান! সেখানেই ত তিনি স্বপ্রকাশ!

আমরা সেবাশ্রমের সদর দ্বার পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া সত্যসত্যই কেমন একটা পবিত্রতা অনুভব করিলাম। যাহা দেখিতে পাইব বলিয়া মনে-মনে কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আমার মনে হইল, আমরা একটা দেবালয়ে প্রবেশ করিলাম। কি সুন্দর স্থান, কি মনোরম দৃশ্য! শত-সহস্র দেবমন্দির অপেক্ষা এ স্থান অধিকতর পবিত্র বলিয়া বোধ হইল।

আমরা প্রাঙ্গণের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমাদিগকে এইভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া গৈরিক-পরিহিত,

নগ্নপদ, মুণ্ডিত-মস্তক একটী যুবক আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ বলিলেন "আমরা এই সেবাশ্রম দেখিতে আসিয়াছি।" যুবক সন্ন্যাসী বলিলেন "আসুন, আমি আপনাদিগকে আশ্রম দেখাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি আমাদিগকে একটী ঘরে লইয়া গেলেন। সেটী আফিস ও লাইব্রেরী। তিনি বলিলেন "এইটী আমাদের আফিস।" আফিস ঘরের মধ্যেই কয়েকটী আলমারীতে কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বের কক্ষেই ডিস্পেন্সারি। সে ঘরটীতেও সমস্ত ঔষধপত্র বেশ সুসজ্জিত; কোন স্থানে কোন বিশৃঙ্খলা নাই। তাহার পার্শ্বের কক্ষটি dress করিবার ঘর। এই ঘরে ব্যাণ্ডেজ ও অন্যান্য আবশ্যক উপকরণ রহিয়াছে।

এই সেবাশ্রম একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা নহে। কলিকাতা ব্যতীত অন্যান্য সহরে যে সকল হাসপাতাল দেখিয়াছি, তাহাতে ওলাউঠা, বসন্ত বা ঐ প্রকার ছোঁয়াচে রোগের চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ আছে; তদ্ব্যতীত আর সকল রোগীকে একই অট্টালিকার বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। কলিকাতার মেডিকেল-কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থা অবশ্য অন্য রকম। কিন্তু এই সেবাশ্রমে ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর রোগীর জন্য ভিন্ন-ভিন্ন কক্ষ নহে—ভিন্ন-ভিন্ন বাড়ী। প্রকাণ্ড চত্বরের মধ্যে যথাযোগ্য ব্যবধানে বিভিন্ন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; কোন গৃহে তিনটী কক্ষ, কোন গৃহে

চারিটী কক্ষ; আর তাহার চারিদিকে খোলা বারান্দা। এই সকল গৃহে আলোক ও বাতাসের অবাধ গতি। আর যেখানে স্থান পাওয়া গিয়াছে, সেখানেই নানা-জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। একটী গৃহও দ্বিতল নহে—কোনটীই বৃহৎ নহে। এই সকল ভিন্ন-ভিন্ন গৃহে বিভিন্ন শ্রেণীর রোগীদিগকে রাখা হইয়াছে; আর তাহাদের সেবার জন্য সন্ন্যাসীরা রাতদিন অবহিত রহিয়াছেন; যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহাই তৎক্ষণাৎ আনিয়া দেওয়া হইতেছে। বেতনভোগী ভৃত্যেরা এমন করিয়া কাজ করিতে পারে না; তাহাদিগকে আহ্বান করিলে হয় ত তাহাদের আসিতে একটু বিলম্ব হয়; কিন্তু এ সন্ন্যাসীদিগের তাহা দেখিলাম না,—সকলেই যেন তৎপর হইয়া আছেন। কি সুব্যবস্থা!

আমরা একটী-একটী করিয়া প্রায় সমস্ত ঘরই দেখিলাম; কেবল যে দিকে স্ত্রীলোকদিগের স্থান, সেই দিকে গেলাম না।

কোথা হইতে এ সকল হইল? কাহারা এই সেবাশ্রম করিল? একই উত্তর—সন্ন্যাসীর দল। মনে করিলেও গর্ব্বে মস্তক উন্নত হইয়া উঠে যে, যাঁহারা এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদেরই রামকৃষ্ণ-সেবকমণ্ডলী। এই 'আমাদের' কথাটা উচ্চারণ করিবার অধিকার লাভ করিয়া যেন জীবনকে ধন্য মনে করিতে হয়। আমাদেরই ত! আমাদেরই শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব;—আমাদেরই শ্রীশ্রী বিবেকানন্দ—আমাদেরই এই সেবাশ্রম; আর যাঁহারা এই আশ্রমের সেবক—তাঁহারাও আমাদেরই;—তাঁহারা

আমাদেরই ভাই—আমাদেরই বন্ধু—আমাদেরই পুত্র! এ আনন্দ—এ আত্মপ্রসাদ কি গোপন করা যায়?

এই রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম—কে সেই মহাপুরুষ—কে সেই সার্থকজন্মা পুরুষপ্রবর—কে সেই দেবতা, যাঁহার মন্ত্রে এই সম্প্রদায় দীক্ষিত; যাঁহার মুখের একটা কথায় এতগুলি যুবক, এতগুলি প্রৌঢ় ব্যক্তি এই সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের **বিবেকানন্দ**। শ্রীশ্রী পরমহংসদেবকে আমি বুঝিতে পারি নাই—বুঝিবার মত সাধনা করিয়া জগতে আসি নাই; তিনি কি ছিলেন, তাহাও অনুভব করিতে পারি নাই—এখনও পারি না—জীবন শেষ হইলেও পারিব না। কিন্তু বিবেকানন্দকে দেখিয়াছিলাম—চিনিয়াছিলাম—বুঝিয়াছিলাম। যখন সেই মহাত্মা তারস্বরে বলিলেন "অন্য পূজা, অন্য উপাসনা বুঝি না—দরিদ্র-নারায়ণ—নর-নারায়ণের সেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা, গরিষ্ঠ উপাসনা" তখনই বুঝিয়াছিলাম বিবেকানন্দ কি? বুঝিয়াছিলাম;—কিন্তু তাঁহার পথ ত ধরিতে পারি নাই;—সে অদৃষ্ট ত লইয়া আসি নহি। কিন্তু হৃদয়ের প্রত্যেক রক্তবিন্দুর মধ্যে, প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছিল—**নরই নারায়ণ**। আজ এই রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে সেই নর-নারায়ণগণকে দেখিলাম। এ যে প্রত্যক্ষ-দর্শন!

এই উপলক্ষে একটা কথা—আর এক মহাত্মার স্বর্গীয় বাণী আমার মনে হইতেছে। কথাটা অনেক স্থানে, অনেকবার

বলিয়াছি; কিন্তু শতবার বলিয়াও তৃপ্ত হই নাই;—আজও আর একবার বলি।

আমি তখন কলেজে পড়িতাম। গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ীতে গিয়াছি;—তখন ছুটী হইলে এখনকার অনেক ছেলের মত আমরা দিল্লী লাহোর বেড়াইতে যাইতাম না; কলিকাতার মেসের অর্দ্ধাহারের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য, মাতা-ভগিনীর রন্ধনশালায় যাইতাম; মধুপুর বৈদ্যনাথের জলবায়ু অপেক্ষা মায়ের অঞ্চলের ব্যজন আমাদিগকে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ করিত। বাড়ীতে গেলে দিনে দশবার যখন-তখন কাঙ্গাল হরিনাথের পদপ্রান্তে যাইয়া বসিতাম; তাঁহার লেখাপড়া, তাঁহার সাধনভজনের বিঘ্ন জন্মাইতাম;—আর সেই মহাপুরুষ আমার সমস্ত আব্দার সহাস্য-বদনে সহ্য করিতেন।

একদিন অপরাহ্নকালে তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি তখন করতাল বাজাইয়া গান করিতেছিলেন—

"অরূপীর রূপের ফাঁদে পড়ে কাঁদে
প্রাণ যে আমার দিবানিশি।"

আমি চুপ করিয়া বসিয়া তাঁহার গান শুনিলাম; আমি যে সেখানে বসিয়াছি, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই—গান করিতে-করিতে এমনই তন্ময় তিনি হইয়া যাইতেন!

গান শেষ হইলে তিনি চক্ষু চাহিলেন; দেখিলেন আমি তাঁহার কাছে বসিয়া আছি। তিনি সহাস্যবদনে বলিলেন "কি রে, কখন এসেছিস্?" আমি বলিলাম "অনেকক্ষণ।" তিনি বলিলেন "তার-

পর।" আমি বলিলাম "এই যে আপনি গান করলেন দাদা, 'অরূপীর রূপ'; ও কথাটা ত মোটেই বুঝতে পারিনে। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর সাকার, না নিরাকার?" কাঙ্গাল একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "তোর কি মনে হয়?" আমি বলিলাম "আমার মনে যা হয়, তা হোক; আপনি কি বলেন, তাই শুনি।" তিনি বলিলেন "বেশ কথা, নিরাকার বানান কর্ ত।" আমি যেমন বানান করিতে হয়, তেমনই করিলাম—নি-রা-কা-র। তিনি বলিলেন "বানান শেখা হয় নাই,তাই এত গোল করিস্। আমি যে বানান শিখিয়ে দিচ্ছি, তাই ভাল করে শেখ। বানান কর—নী-রা-কা-র। বুঝলি—নীরাকার,—অর্থাৎ কি না, জলের আকার; যে আধারে রাখা যায়, সেই রকম আকার। তোর আধার যেমন, তেমনি তাঁর আকার। কিছুদিন এই বানান দিন-রাত মুখস্থ করবি। তারপর হঠাৎ একদিন দেখ্‌তে পাবি, তোর দীর্ঘ-ঈকার হ্রস্ব হয়ে গেছে। তখন পাবি নি-রা কা-র। তখন খুব ঘন-ঘন, দমে-দমে, নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে বানান করবি—নি-রা-কা-র। কিছুদিন গেলে হঠাৎ একদিন দেখ্‌তে পাবি, তোর হ্রস্ব-দীর্ঘ সব চলে গেছে; তখন হয়েছে—ন-রা-কা-র। বুঝলি ভাই, অরূপীর রূপ কি!" শিখিলাম বটে—কিন্তু বুঝিলাম না। এত-কাল পরে এই রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে দাঁড়াইয়া সত্যসত্যই প্রত্যক্ষ করিলাম—কাঙ্গালের সাধন-প্রকরণের শেষ ধাপে এই সব সন্ন্যাসী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন;—এঁদের কাছে—তিনি নরাকার

—স্বামী বিবেকানন্দের সেই নর-নারায়ণ। নরকে নারায়ণ মনে না করিলে কি তাঁহাদের এমন করিয়া সেবা করা যায়? কি মন্ত্রই দিয়া গিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ! কি তেজ সেই মন্ত্রের! কি শিক্ষা, কি দীক্ষা! তেমন মহাপুরুষের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত না হইলে কি এই সকল যুবক এমন করিয়া এই সেবাব্রতে দীক্ষিত হইতে পারিতেন? কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই, কোন আশঙ্কা নাই—তাঁহারা যে নর-নারায়ণের সেবা করিতেছেন—তাঁহারা যে মহাপুরুষের নিকট হইতে এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ধন্য রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম! ধন্য স্বামী বিবেকানন্দ! আর ধন্য এই মহাপ্রাণ সেবকগণ!

কাশীতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলে অক্ষয়স্বর্গ লাভ হয়, একথা হিন্দুমাত্রেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই সেবাশ্রমের আর্ত্ত, দরিদ্র-নারায়ণগণের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করাও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই সেবাশ্রমে অনেকে মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন; আমি ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়গৃহকেই মন্দির বলিতেছি। এই সকল মন্দিরগাত্রে দাতাদিগের নাম প্রস্তরফলকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দুই চারিজন ধর্ম্মপ্রাণা মহিলাও কয়েকটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

এই রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের কোন জমিদারী বা তালুক-মুলুক নাই; দশজনের দানের অর্থেই এই সেবাশ্রমের সেবাকার্য্য

নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। একটী প্রবচন আছে—"সাধু যাহার সঙ্কল্প, ভগবান তাহার সহায়" ; এই বাক্যের জ্বলন্ত প্রমাণ এই রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম! এত বড় সেবাশ্রমের কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই বলিলেই হয় ; সামান্য যাহা আছে, তাহাতে এই আশ্রমের ব্যয়ের সামান্য অংশই নির্ব্বাহিত হইতে পারে। কিন্তু অর্থের অভাব হয় না, সেবকের অভাব হয় না ; যাঁহার কাজ তিনিই করাইয়া যাইতেছেন। যে ভূমিখণ্ডের উপর এই সেবাশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে আর গৃহ-নির্ম্মাণের স্থান নাই। সেইজন্য তাহার পার্শ্ববর্ত্তী একখণ্ড ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে ; শীঘ্রই সেখানে গৃহ-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে।

এই সেবাশ্রমের গায়েই **অদ্বৈত-আশ্রম**। এই আশ্রমও রামকৃষ্ণমণ্ডলী কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত। আমরা সেবাশ্রমের পার্শ্ববর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র দ্বারপথে অদ্বৈত-আশ্রম দর্শন করিতে গেলাম। এই আশ্রম ভবিষ্যৎ সেবক-সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয় ; বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়,—আর শিক্ষা দেওয়া হয়, কেমন করিয়া নরনারায়ণগণের সেবা করিতে হয়। এই আশ্রমে অনেকগুলি যুবক সন্ন্যাসী দেখিলাম ; দুই চারিজন প্রৌঢ় সন্ন্যাসীও আছেন। আমার সঙ্গী শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের পরিচিত একটী যুবক এই আশ্রমে আছেন। যুবকটী রবীন্দ্রের সতীর্থ ছিলেন ; রসায়নশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত

এম, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই সেবাশ্রমের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। যুবকটী যেমন ধীর, তেমনই বিনয়ী। শুনিলাম, এই সেবাশ্রমে একটী রসায়নাগার প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায় আছে। ভিন্ন ভিন্ন সেবাশ্রমে যে সকল ঔষধের প্রয়োজন হয়, তাহা কোন একটী আশ্রম হইতে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিলে সকল রকমেই সুবিধা হয়। এই যুবকটী সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

অদ্বৈত-আশ্রম হইতে আমরা পুনরায় সেবাশ্রমে গেলাম। তখন তিন-চারিজন সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহাদের পরিদর্শন-পুস্তকে আমি আমার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করি। আমি সবিনয় নিবেদন জানাইলাম যে, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি; আমার মন্তব্যের কোনই মূল্য নাই। আমি ভগবানের নিকট এই সেবাশ্রমের উন্নতি কামনা করি। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই আমাকে ছাড়িবেন না; তাঁহারা যে আমাকে জানেন, এ কথাও ব্যক্ত করিলেন। আমি বলিলাম "আমি আপনাদেরই একজন অধম সেবক; আমার মন্তব্যের কিছুই প্রয়োজন নাই।" কিন্তু তাঁহারা সে কথা শুনিলেন না। আমি বাধ্য হইয়া পুনরায় তাঁহাদের আফিসগৃহে প্রবেশ করিলাম এবং যাহা মনে আসিল, তাহাই লিখিয়া দিলাম। তারপরে তাঁহাদিগের অভিবাদন করিয়া সেবাশ্রম হইতে বাহির হইলাম।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমান রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়াই

গঙ্গাস্নানে গেলাম। যাঁহাদের বাড়ী হইতে গঙ্গা দূরে, বা যাঁহারা স্নানের পর পূজাদি এবং ঠাকুর দর্শন করিয়া বাড়ীতে ফেরেন, তাঁহারা শুষ্ক-বস্ত্র সঙ্গে লইয়া যান। আমাদের বাড়ীও নিকটে, স্নানান্তে পূজাদিও করি না; এবং সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের মধ্যে মন্দিরে-মন্দিরে ঘুরিয়া দেবদর্শনও করি না; তাই আমরা শুষ্ক-বস্ত্র সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে যাই না।

একদিন এক বন্ধু প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আমি পূজা-আহ্নিক করি না কেন? কাশীতে আসিয়াছি, দেবদেবী দর্শন, জপতপ করা আমার এখন কর্ত্তব্য। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম "দেখা যাক্।" তিনি বলিলেন "আর দেখ্‌বে কি? বয়স ত ৫০ পার হয়েছে; এখনও যদি ধর্ম্মকর্ম্ম না কর, তা হলে পরকালে কি হইবে?" অন্য কেহ হইলে হয় ত তর্ক জুড়িয়া দিত! আমার তর্ক করা অভ্যাস নাই; বিশেষ, কোন কথা লইয়া তর্ক করিতে হইলে যে সকল অস্ত্র থাকা দরকার, আমার তাহা কিছুই নাই; পড়াশুনায় আমি একেবারে মা সরস্বতীর ত্যজ্যপুত্র। সুতরাং তর্ক করিলাম না; বলিলাম "আপনার উপদেশে কৃতার্থ হইলাম।" তাহার পর ভাবিয়া দেখিলাম, জপ তপ ত কিছুই করি না, পূজা-আহ্নিক কাহাকে বলে তাহাও জানি না। শুনিয়াছি, গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে হয়; সে মন্ত্র জপ করিতে হয়। মন্ত্রগুরু ত করি নাই;—পাই নাই, এ কথা বলিতে পারিব না; ইচ্ছা হইলে, আগ্রহ হইলে মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারিতাম। সে আগ্রহ

হয় নাই। লোক-দেখান পূজা-আহ্নিক—সে আমার কোষ্ঠীতে লেখে না। যেখানে শাস্ত্রালোচনা হয়, সেখান হইতে উঠিয়া যাই—বুঝিবার ভাণ করিতে পারি না; সকলের সঙ্গে মাথা নাড়িয়া, দুই-একটা শ্লোক আওড়াইয়া শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রবণতার পরিচয় দেওয়া আমার দ্বারা হইয়া উঠে না। ইহার জন্য আমাকে যদি কেহ নিন্দা করেন, সে নিন্দা আমি অবনতমস্তকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। ও সকল কথা কেহ তুলিলে আমার এই কথাটাই সর্ব্বদা মনে হয়—

"অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"

ও কথা এখন থাকুক—আমরা গঙ্গাস্নান করিতে গেলাম। স্নান শেষ হইলে শ্রীমান্ রবীন্দ্রকে বলিলাম "চল, বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া বাড়ী যাই।" তখন দুইজনে ভিজা-কাপড়েই বিশ্বনাথ দর্শন করিতে গেলাম। বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া বাড়ী ফিরিবার কথা; কিন্তু তখন মনে হইল, মানমন্দিরটা আর বাকী থাকে কেন? আমরা মানমন্দির দেখিতে গেলাম।

মানমন্দির

দেখিতে গেলাম বটে; কিন্তু দেখিবই বা কি, আর বুঝিবই বা কি। তবুও দেখিতে হয়, তাই দেখিলাম। এই মান-

মন্দির মহারাজ জয়সিংহের নির্ম্মিত। দেখিলাম, জ্যোতিষ্ক-নির্ণয় ও গ্রহ-নিরূপনের ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত বৃত্ত, চতুর্ভুজক্ষেত্র, সোপান, দিগ্দর্শন, প্রাচীর, ত্রিভুজ, স্তম্ভ-যন্ত্র ও দিগংশ-যন্ত্র প্রভৃতি দণ্ডায়মান থাকিয়া সগর্ব্বে হিন্দু-জ্যোতিষের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। মহারাজ জয়সিংহ শুধু কাশীতেই এই মানমন্দির নির্ম্মিত করেন নাই; মথুরা, দিল্লী, জয়পুর, ও উজ্জয়িনীতেও মানমন্দির নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। শুনিলাম, কাশীর মানমন্দিরে নানাবিধ বহুমূল্য যন্ত্রাদি ও গ্রন্থাবলী ছিল। তাহার অধিকাংশই এখন ইংলণ্ডের কেসিংটন মিউজিয়মে রহিয়াছে।

মানমন্দির দর্শন শেষ করিয়া আমরা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। অপরাহ্ণকালে নৌকায় চড়িয়া গঙ্গার মধ্য হইতে কাশী দর্শন করিবার ব্যবস্থা হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্র দাদার পুত্রগণ ও সুগায়ক শ্রীমান দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচিকে সঙ্গে লইয়া আমরা গঙ্গাতীরে গেলাম এবং একখানি নৌকা ভাড়া করিলাম। ব্যবস্থা হইল যে, অসি হইতে বরুণা পর্য্যন্ত যাইতে হইবে; কারণ তাহা হইলে কাশীর সমস্ত ঘাটই দেখা হইবে। নৌকায় উঠিয়াই বাগচি ও দেবেন্দ্র দাদার ছেলেরা গান আরম্ভ করিয়া দিলেন। পূজনীয় নাট্যকার পরলোকগত দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ ভায়া স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার জন্মভূমির' অনুসরণে 'কাশী-বারাণসী' নামে যে সুন্দর গীত রচনা করিয়াছিলেন, সকলে মিলিয়া

সেই গানটী গায়িলেন। গঙ্গাবক্ষে বসিয়া গানটী শুনিয়া প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল। গানটী এই স্থানে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। শ্রীমান ললিতচন্দ্র ১৩২০ সালের মহাষ্টমীর দিন কাশীতে বসিয়াই এই গানটী রচনা করিয়াছিলেন।

১

কত পুণ্য-তীর্থে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে তীর্থ এক সকল তীর্থ-সেরা,
ধ্যানে গড়া তীর্থ সে যে, সাধনাতে ঘেরা;
হায় রে যেমন তারার মাঝে পূর্ণিমার শশী,
সকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী-বারাণসী।

২

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, মান-মন্দির উজল করা;
সবাই পূজেন বিশ্বনাথে পায়ে মাথা রেখে,
তারা আরত্রিকে ঘুমিয়ে, উঠে আরত্রিকে জেগে,
হায় রে যেমন তারার মাঝে পূর্ণিমার শশী,
সকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী-বারাণসী।

৩

এমন পুণ্য-নদী কাহার, কোথায় এমন তটের বাহার,
ও-পারেতে ব্যাসের ক্ষেত্র আকাশ-তলে মেশে;
যুগল-চরণ ধৌত করে অসি-বরুণা এসে;

হায় রে যেমন তারার মাঝে পূর্ণিমার শশী,
সকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী-বারাণসী।

৪

মন্দিরেতে ভরা পুরী, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ভূরি;
সুদূর হতে আসে যাত্রী ভক্তি-অর্ঘ্য লয়ে,
তারা চরণ-তলে লুটিয়ে পড়ে চরণধূলি খেয়ে;
হায় রে যেমন তারার মাঝে পূর্ণিমার শশী,
সকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী-বারাণসী।

৫

অন্নপূর্ণার পুণ্য-স্নেহ, কোথায় এমন পাবে কেহ,
ছিলেন শিব আত্ম ভুলি ভিক্ষা-দণ্ড ধরি;
ঐ চরণের ধূলি যেন সদা মাথায় করি;
হায় রে যেমন তারার মাঝে পূর্ণিমার শশী,
সকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী-বারাণসী।

গান শেষ হইয়া গেল, কিন্তু তাহার সুরটি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাণে বাজিতে লাগিল। আমাদের ডিঙ্গী-নৌকা তখন উজান যাইতেছে। দেবেন্দ্র দাদার ছেলেরা দেখিলাম, কাশীর নাড়ীনক্ষত্র সব জানে। তাহারা ভূগোলসূত্র আওড়াইবার মত একে-একে ঘাটগুলির নাম বলিতে লাগিল। এত নাম্র যদি মনে রাখিতে পারিতাম, তাহা হইলে ত লেখাপড়াই শিখিতে পারিতাম। সেই একরাশি নামের মধ্যে যে কয়টা মনে আছে,

তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। নামগুলি কিন্তু পর-পর হইবে না। এই শুনুন নাম—দশাশ্বমেধ ঘাট, মণিকর্ণিকা ঘাট, কেদার ঘাট, মানমন্দির ঘাট, অহল্যাবাই ঘাট, রাজ ঘাট, অসি ঘাট। আরও শুনিবেন কি? নাম বলিতে গেলে কম-বেশী তিনকুড়ির উপর ঘাটের নাম বলিতে হয়। সে চেষ্টা করিয়া কাজ নাই। ইহার কোন ঘাটেই আমার জীবন-তরি কোন দিন ভিড়িবে না। কাশীর ঘাটে জীবন-বিসর্জ্জন ভাগ্যে নাই। এখন:সুধু প্রার্থনা—

"এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি।"

ঘাটে ঘাটে মহিলাগণ দীপ ভাসাইতে লাগিলেন; কত ঘাটের সোপানাবলী দীপালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময় কাশীর গঙ্গাতীরের দৃশ্য বড়ই মনোরম, বড়ই পবিত্র-ভাবো-দ্দীপক। কত নরনারী সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন, কতজন ঘাটে বসিয়া সুরধুনীর শোভা দর্শন করিতেছেন; আর আমরা নদীর মধ্যে ভাটি নৌকায় বসিয়া এই সকল দৃশ্য দেখিতেছি।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই আমাদের নৌকা আসিয়া একস্থানে তীর-সংলগ্ন হইল। আমরা নৌকা হইতে নামিয়া বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করিতে গেলাম। এ আরতির বর্ণনা অনেকেই করিয়াছেন; আমি আর কি বলিব? আরতি শেষ হইলে বিশ্ব-নাথকে প্রণাম করিয়া মন্দির ত্যাগ করিলাম।

দশদিন শেষ

দশদিনের ছুটী আজ শেষ;—আজ আমাকে কাশী ত্যাগ করিতে হইবে। আজ রবিবার—পরদিন দশটার সময়ে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া আবার যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

আজ প্রাতঃকালে উঠিয়াই কিঞ্চিৎ বাজার করিতে গেলাম। যে দোকানে যাহা দেখি, তাহাই কিনিতে ইচ্ছা করে। নিজের জন্য কিছুই নহে,—দশদিনের জন্য যাহাদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহাদের জনে-জনের জন্য নানা দ্রব্য কিনিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ কবে সফল হইয়া থাকে। আমার তখন এক বন্ধুর কথা মনে হইল। তিনি মফস্বলে থাকেন; অনেক অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে কলিকাতায় আনা যায় না। কেন তিনি কলিকাতায় আসিতে চান না, একদিন সে কথা বলিয়াছিলেন—"কলিকাতায় যাই না কেন জান? কলিকাতায় গেলে আমি যে গরীব, এ কথা পদে-পদে মনে হয়। যে দোকানের দিকে চোক ফিরাই, সেই দোকানের জিনিষই কিনিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু অবস্থায় কুলায় না। আর আমাদের পাড়াগাঁয়ে কোন বালাই নাই, আমাদের বাজারে যাহা পাওয়া যায়, তার সবই কিছু-কিছু কেনা আমার সাধ্যায়ত্ত। কলিকাতায় আসিয়া পদে-পদে নিজের দারিদ্র্য স্মরণ করিবার

দরকার কি?” কথাটা কিন্তু ঠিক। কাশীতে আমার ঐ কথাই মনে হইয়াছিল।

যাহা হউক, সামান্য দুইচারিটা জিনিষ ক্রয় করিলাম। দশদিনের পর বাড়ী যাইব; চারিদিক হইতে ছেলেমেয়েরা ঘিরিয়া দাঁড়াইবে; সকলের হাতেই কিছু-না-কিছু দিয়া দশদিন পরে তাহাদের হাসিমুখ দেখিব। দূরে থাকিলে কি হয়? ইংরাজ কবি ঠিক কথাই বলিয়াছেন—

'Drags at each remove a lengthening chain.'

জীবনের অবসানকালে যাহাদের লইয়া বাজার বসাইয়াছি, তাহারা যে আমারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে; তাঁহাদের সুখ-সাচ্ছন্দ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সবই যে আমার মধ্যেই নিবদ্ধ। তাহাদিগকে কি ভুলিতে পারা যায়? কবি ত বলেন—

“যাদের চাহিয়ে তোমারে ভুলেছি
তারা ত চাহে না আমারে;
তারা আসে তারা চ'লে যায় দূরে,
ফেলে যায় মরু-মাঝারে।”

তারা ত আমাকে চাহে না, কিন্তু আমি যে তাহাদিগকে চাই! তাহাদের মুখ চাহিয়া **তাঁহাকে** ভুলিয়া যাইব কেন? ঐ কথাটা আমি বুঝি না। তিনি যাহাদিগকে আমার তত্ত্বাবধানে পাঠাইয়াছেন, তাহাদের মুখ চাহিয়া যে **তাঁহারই** কথা মনে হইবে। সুকুমার শিশুর মুখ দেখিলে **তাঁহার** প্রসন্ন-

বদন মনে হইবে না কেন? তাহার আধ-আধ স্বর শুনিয়া ভগবানের নাম মনে পড়িবে না কেন? এ সকল কি আমার? এ সকলের কর্ত্তা কি আমি? ইহারা কি আমার ইচ্ছায় আসিয়াছে, ইহারা কি আমার কথায় থাকে, আমার কথায় যায়? কৈ, আমার কর্ত্তৃত্ব ত কিছুই দেখি না। সবই তাঁর। তাঁহারই দেওয়া জিনিষে পরিবৃত থাকিয়া তাঁহার কথা ভুলিব কেন? কাঙ্গাল হরিনাথ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "ওরে বোকা, গৈরিকপরা সন্ন্যাসী 'শিবশম্ভু' বলিয়াও যাঁকে ডাকে, তুই ছেলেটি কোলে ক'রে বড় সোহাগভরে 'বাবা আমার' ব'লেও তাঁকেই ডাকিস্—সন্ন্যাসীর 'শিবশম্ভু'ও যিনি, তোর 'বাবা আমার'ও তিনিই। তিনিই, যার যেমন সাধন-পথের প্রয়োজন, তাই ক'রে দিয়েছেন। এই সোজা কথাটুকু বুঝিলেই ত গোল মিটে যায়। তাল হারাস নে রে ভাই, তাল হারাস নে।" এই সকলের জন্যই ত কবি কুমুদরঞ্জনের মত বলিতে ইচ্ছা করে—

"আমরা গৃহী, ছাড়তে নারি,
    ভাঙ্গতে নারি সুখের গৃহ ;
হোক্ সে কারা, শান্তি-হারা,
    হোক্ সে যতই নিন্দনীয়।
হেথা কোকিল-ডাকার আগে,
খোকা-খুকী আগেই জাগে,

কমল-ফোটার আগেই ফোটে
বদনকমল সবার প্রিয়।
তন্দ্রাবিহীন দিবস-নিশি
জাগছি সদা কুটীরধারে,
অন্ধ মনে ফিরাই পাছে
অতিথ্ কোন দুর্ব্বাসারে;
পাদ্য এবং অর্ঘ্য লয়ে,
বসে আছি পথটি চেয়ে,
হৃদয়নাথের পরশ পাব
হয় ত দুঃখের অন্ধকারে।"

না, কবি,—'হয় ত' কেন—এই দুঃখের অন্ধকারে হৃদয়নাথের দর্শন আমরা নিশ্চয়ই পাইব। অন্ধকার না হইলে কি আলোক ফুটিয়া উঠে? অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাইও না;—ঐ অন্ধকারই আলোকের অগ্রদূত— ঐ অন্ধকাররাশির পশ্চাতে—

"ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
ভব জলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।"

দশদিনের ভ্রমণ শেষ হইল—এখন ফিরিবার কথা। রবিবার অপরাহ্ণ তিনটার গাড়ীতে আমরা কাশী ত্যাগ করিলাম। দেবেন্দ্র দাদার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ আমার সঙ্গী হইলেন,—তাঁহাকেও সোমবারে আফিসে উপস্থিত হইতে হইবে।

মোগলসরাই ষ্টেশনে লোকারণ্য। আমরা মেল গাড়ীতে

উঠিতেই পারিলাম না; একস্‌প্রেস গাড়ীতে অতি কষ্টে একটু বসিবার স্থান করিয়া সারারাত্রি জাগিয়া গ্রাণ্ড-কর্ড রেলপথ দিয়া সোমবার প্রাতঃকালে হাবড়ায় পৌছিলাম। দশদিন পরে আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

কত কথা বলিবার জন্য এই 'দশদিন' লিখিতে বসিয়াছিলাম; এখন দেখিতেছি, তাহার কিছুই বলিতে পারি নাই। বুঝিলাম, বলিবার চেষ্টা বৃথা; আমি ভাষা হারাইয়াছি, আমার ভাবের সামঞ্জস্য হয় না, আমার কথা যোগায় না। যাঁহাদের আগ্রহে আমি লিখিতে বসিয়াছিলাম, তাঁহারা আমার এই অকৃতকার্য্যতা দর্শন করিয়া ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইবেন; তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি কোনদিনই কোন কথা গোছাইয়া বলিতে পারি নাই; যখন উৎসাহ ছিল, উদ্যম ছিল, মনে বল ছিল, তখনই পারি নাই;—আর এখন ত সে সব কিছুই নাই—এখন কেমন করিয়া লিখিব। ইহা বিনয়ের কথা নহে; ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার এই—

'দশদিন'